কুহেলিকা

এক

নারী লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।...

তরুণ কবি হারুন তাহার হরিণ-চোখ তুলিয়া কপোত-কুজনের মতো মিষ্টি করিয়া বলিল, 'নারী কুহেলিকা।'

যে স্থানে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা আসলে 'মেস' হইলেও হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটি পুরোমাত্রায় আড্ডা।

দুই তিনটি চতুষ্পায়া জুড়িয়া বসিয়া প্রায় বিশ-বাইশজন তরুণ। ইহাদের একজন—লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা—একজন ইয়ারের উরু উপাধান করিয়া আর একজন ইয়ারের দুই স্কন্ধে দুই পা তুলিয়া দিয়া নির্বিকার চিত্তে সিগারেট ফুঁকিতেছে। এ আলোচনায় কেবল তাহারই কোনো উৎসাহ দেখা যাইতেছিল না। নাম তাহার—বখ্‌তে জাহাঙ্গির কি উহা অপেক্ষাও নসিব-বুলন্দ দারাজ গোছের একটা-কিছু। কিন্তু অব্যবহারের দরুন তাহা এখন আর কাহারও মনে নাই। তাহাকে সকলে উপেক্ষা বা আদর করিয়া উল্‌ঝলুল্‌ বলিয়া ডাকে। এ নাম কে তাহাকে প্রথম দিয়াছিল এখন আর কেহই বলিতে পারে না। এ নাম দেওয়ার গৌরবের দাবি লইয়া বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এখন এই নামই তাহার কায়েম হইয়া গিয়াছে। 'উল্‌ঝলুল্‌' উর্দু শব্দ, মানে এর—বিশৃঙ্খল, এলোমেলো।

কবি হারুন যখন নারীকে 'কুহেলিকা' আখ্যা দিল, তখন কেহ হাসিল, কেহ টিপ্পনি কাটিল,—শুধু উল্‌ঝলুল্‌ কিছু বলিল না। এক টানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সিগারেট পুড়াইয়া তাহারই পুঞ্জিভূত ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া শুধু বলিল—'হুম!'

আমজাদ ওকালতি পড়ে এবং কবিতা লেখার কসরৎ করে। সে বলিল, 'তার চেয়ে বল না কবি, নারী প্রহেলিকা! বাবা, সাতসমুদ্দুর তের নদীর সাঁতরিয়েও বিবি গুলে-বকৌলির কিনারা করা যায় না!'—বলিয়াই একবার চারদিকে ঝটতি চোখের সার্চ-লাইট বুলাইয়া লইল। মনে হইল, সকলেই তাহার রসিকতায় রসিয়া উঠিয়াছে। কেবল হারুন যেন একটু মুচকিয়া হাসিল।

উল্‌ঝলুল্‌ এক রাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত শব্দ করিল—হুম।

একটু যেন বিদ্রূপের আমেজ! আমজাদ অপ্রতিভ ও ক্ষুণ্ণ হইল। কেহ কেহ হাসিলও যেন।

আশরাফ নতুন বিবাহ করিয়াছে, তাহার বধূ ত্রয়োদশী—যৌবনমুখী। কিন্তু এত সাধাসাধি করিয়া, এত চিঠি লিখিয়া, সে কেবল একটিমাত্র পত্রের উত্তর পাইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক পত্রোত্তর নয়। তাহাতে শুধু লেখা ছিল দুইটি লাইন—'রমনীর মন,

সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন !' বধূ রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছে। আশরাফ তাহার বাম হাতের তালুর উপর দক্ষিণ হাতের মুষ্টি সজোরে ঠাসিয়া দিয়া বলিল, 'নারী অহমিকা !'

উল্‌ঝলুল্ এইবার বেশ জোরেই পূর্বমতো শব্দ করিয়া উঠিল—হুম্‌ম্। এইবার তারি মধ্যে একটু অভিনয়ের কারুণ্যের আমেজ।

সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। মনে হইল, একসঙ্গে এক ঝাঁকা থালা বর্‌তন পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।

আশরাফ লাফাইয়া উল্‌ঝলুলের চাঁচর-চুলের গুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল, 'এই উল্লুক, অমন করলি যে?'

এমন ইয়ার্কি ইহাদের মধ্যে প্রায়ই হয়।

উল্‌ঝলুল্ ফিরিয়াও দেখিল না। পূর্বের মতো সচ্চিদানন্দ হইয়া শুইয়া সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

রায়হান কয়েক বৎসর হইতেই কলিকাতায় বসিয়া বি.এ. ফেল করিতেছে। ইহারই মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং বিবাহের অপরিহার্য পরিণাম সন্তান-সন্ততি একটু ঘটা করিয়াই আসিতে শুরু করিয়াছে। রায়হান কিন্তু যত বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, ততই মোটা হইতেছে। তবে উহাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পা ও মাথা মোটাইয়া কুলাইয়া উঠিতেছে না। মেসে তাহার আদরের ডাকনাম 'কুম্ভীর মিঞা'। কুম্ভীর মিঞা কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া যাহা বলিল—তাহাতে মনে হইল, কেহ তাহার কণ্ঠে অনেকগুলা বাঁশের চ্যাচারি পুরিয়া দিয়াছে।

হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

উল্‌ঝলুল্ এক লম্ফে স্প্রিং-এর পুতুলের মতো লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর কুম্ভীর মিঞার ভুঁড়ির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আবার সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

তারিকের রসিক বলিয়া নামডাক আছে। উল্‌ঝলুলের দৃষ্টি লক্ষ করিয়া বলিল, 'কি হে, ভুঁড়ি কসছ নাকি? কত কালি হবে বল তো !'

আবার হাসির কোরাস! যেন অনেকগুলি নোড়া শানের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে ও আসিতেছে!

উল্‌ঝলুল্ যেন কিছুই শুনিতেছিল না। সে উর্ধ্ব-নয়ন হইয়া হুস করিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া জড়িতকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, 'নারী নায়িকা !'

তাহার বলিবার ভঙ্গি ও ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। কে একজন পিছন হইতে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, 'বাহ্‌বা, কি তেয়সা।'

ইউসুফ একটু স্থূল ধরনের। বেঁকিয়ে বলা সে বুঝিতও না পছন্দও করিত না। সে উল্‌ঝলুল্‌কে এ কথার অর্থ আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য ধরিয়া বসিল।

অনেকেই তাহার সহিত এই অনুরোধে যোগদান করিল।

উল্‌ঝলুল্ অটল। শুধু আর একবার পূর্বের মতো করিয়া বলিল, 'নারী নায়িকা !'

সকলে তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া হারুনকে ধরিয়া বসিল।...

হারুন সত্যই কবি। তাহার খ্যাতি ইহারই মধ্যে বেশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তবে সে খ্যাতি হয়তো হেনা-চাঁপা-বকল-কেয়ার মতো সতীর দর-সঞ্চারী নয়। গোলাবের মতো যতটুকু গন্ধ যাইতেছে, অন্তত ততটুকু স্থান মিষ্টিস্নিগ্ধতায় ভরপুর করিয়া তুলিতেছে। সুন্দর ছিপছিপে গড়ন। রং বেশ ফর্সাই। একটু উদাস-উদাস ভাব। যেন সে নিজেকে জানে না, চেনে না। অথবা জানিয়াও অবহেলা করে। রং আর রূপ ছাড়া, পৃথিবীর আর কোনো-কিছুতে যেন তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, কৌতূহল নাই। সবচেয়ে সুন্দর তাহার চোখ। অবশ্য দেখিতেও সে প্রিয়দর্শন। চোখ দুটি যেন কোনো সেকালের মোগল-কুমারীর—বাদশাজাদির। তবে কেমন যেন বিষাদখিন্ন। দৃষ্টি আবেশ-মাখা স্বপন-জড়িত। যখন সে কারুর পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, মনে হয়—সে যাহাকে দেখিতেছে, দৃষ্টি তাহাকে পারাইয়া গিয়াছে—সে দেখার অতীতকে দেখিতেছে।...

সে এইবার বি.এ. দিবে। তবে পড়ায় তাহার বিশেষ ইচ্ছা নাই। পড়ায় মানে—কলেজের পড়ায়। 'বাজে বই' সে যথেষ্ট পড়ে।—অর্থাৎ পৃথিবীর নামজাদা এমন কোনো লেখক বা কবি নাই, যাঁহার সম্বন্ধে সে জানে না।

তবু সে মন দিয়াই পড়িতেছে। সে পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার দিকেই সংসার তাকাইয়া আছে—যেমন করিয়া ভিখারি খঞ্জ তাহার একমাত্র অবলম্বন যষ্টির দিকে তাকাইয়া থাকে।

তাহার পিতা অন্ধ, মাতা উন্মাদরোগগ্রস্তা। বাড়িতে দুইটি অবিবাহিতা বোন এবং একটি ছোট ভাই। পিতা যে পেনশন পান, তাহাতে ভাতে-ভাত খাইয়া দিন চলে, তাহার বেশি আর চলে না। ছোট ভাইটি গ্রামের ইস্কুলে পড়ে। সে-ই সংসার দেখে।

হারুন টিউশনি করিয়া নিজের খরচ চালায় এবং বাড়িতে ছোট ভাইটিকে নিজে না খাইয়াও দশটি করিয়া টাকা পাঠায়।

বাড়ি তাহার বীরভূম জেলায়। ... যাক যাহা বলিতেছিলাম—

মেস-বাহিনী পাকড়াও করিয়া বসিল হারুনকে, 'কবি, বলো তোমার কুহেলিকার অর্থ।'

সে কিছু বলিবার আগেই কেহ বলিল, 'কবি প্রেমে পড়েছে! কেহ বলিল, 'বাবা! যা-সব হেঁয়ালি কবিতা লেখা হচ্ছে আজকাল!' কেহ বলিল,—'চোখ দুটি ক্রমেই যে রকম ঢুলুঢুলু হচ্ছে দিন-কে-দিন, কোথায় শিরাজি টানছ বাবা? আমরা কি সে ভাঁটিখানার সন্ধান পেতে পারিনে?'—ইত্যাদি।

হারুন তাই বলিয়া মিনমিনে ছেলেও নয়। সে বলিল, 'অত গোলমাল করলে বলি কি করে বল? আমার বলা ত তোমরাই বলে নিচ্ছ।'

কুম্ভীর মিঞা হাঁকড়াইয়া উঠিল, 'এই! সব চোপ। বাস, আর একটি কথা কইছ কি—ভুঁড়ি চাপা! একেবারে ব্যাং-চ্যাপ্টা!'

হারুন বলিল, 'নারী শুধু ইঙ্গিত, সে প্রকাশ নয়। নারীকে আমরা দেখি বেলাভূমে দাঁড়িয়ে—মহাসিন্ধু, দেখার মতো। তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের যতটুকু দেখা যায়, আমরা

নারীকে দেখি ততটুকু। সমুদ্রের জলে আমরা যতটুকু নামতে পারি, নারীর মাঝেও ডুবি ততটুকুই। ... সে সর্বদা রহস্যের পর রহস্য-জাল দিয়ে নিজকে গোপন করছে—এই তার স্বভাব।...

হারুন যেন দিশা হারাইল। মনে হইল, সে যেন চকোরের মতো চাঁদের সুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! সে যেন পরিস্থানে শুইয়া ফুল ফোটার স্বপন দেখিতেছে।

সে বলিয়া যাইতে লাগিল, 'কী গভীর রহস্য ওদের চোখে-মুখে। ওরা চাঁদের মতো মায়াবি ; তারার মতো সুদূর। ছায়াপথের মতো রহস্য। ... শুধু আবছায়া, শুধু গোপন। ওরা যেন পৃথিবী হতে কোটি কোটি মাইল দূরে। গ্রহ-লোক ওদের চোখে চেয়ে আছে অবাক হয়ে—খুকি যেমন করে সন্ধ্যাতারা দেখে। ওদের হয়তো শুধু দেখা যায়, ধরা যায় না। রাখা যায়, ছোঁয়া যায় না। ওরা যেন চাঁদের শোভা, চোখের জলের বাদলা-রাতে চারপাশের বিষাদ-ঘন মেঘে ইন্দ্রধনুর বৃত্ত রচনা করে। দু-দণ্ডের তরে, তারপর মিলিয়ে যায়। ওরা যেন জলের ঢেউ, ফুলের গন্ধ, পাতার শ্যামলিমা, ওদের অনুভব কর, দেখ, কিন্তু ধরতে যেয়ো না।'

সকলে মুগ্ধবিস্ময়ে শুনিতেছিল। কিন্তু তাহারা শুনিতেছিল, না সুন্দরকে—কবিকে দেখিতেছিল, বলা দুষ্কর। হঠাৎ উল্‌ঝলুল্ হারুনের অসমাপ্ত সুরের সহিত সুর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, 'ঢেউ ধরতে গেলেই জলে ডুববে। গন্ধ ধরতে গেলেই বিঁধবে কাঁটা। শ্যামলিমা ধরতে গেলেই বাজবে শাঁখা। নারী দেবী, ওঁকে ছুঁতে নেই, পায়ের নিচে গড় করতে হয়। ... কিন্তু কবি, নারী নায়িকা। ও ছাড়া নারীর আর কোনো সংজ্ঞাই নেই।'

অনেকেই না বুঝিয়া হাসিল। কেহ মজা অনুভব করিল, কেহ মানে বুঝিল না।

তারিক তাহার রসিক নাম বজায় রাখিবার জন্য দিগবসন পর্যন্ত হইতে রাজি। সে মুখ বিকৃত করিয়া স্বর কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিল, 'ওরে ব্যাটা, তাই তোমার তনু দিনের দিন এমন ক্ষীণ হচ্ছে! তুমি যে নায়ক হয়ে বসে আছ, তা কে জানে! তোমার ডিসপেপ্‌সিয়া হয়েছে! যাও, শীগগির এক শিশি 'কুওতেমেদা' কিনে খেয়ে ফেলো!'

হাসির তুফান বহিয়া গেল!

উল্‌ঝলুল্ দৃকপাতও করিল না। নির্বিকারচিত্তে সিগারেট পোড়াইয়া ধূম্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

সে বরাবরই এই রকমের।

হারুন এইসব বাজে হুল্লোড়ে যোগদান করিতেছিল না বটে, তবে সে যে এসব উপভোগ করিতেছিল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল।

হারুন সাধারণত একটু কম কথা বলে, কিন্তু দরকার হইলে এত বেশি বলে যে, তাহা প্রায় বক্তৃতা হইয়া ওঠে।

হারুনের ওপর সকলেরই বেশ একটা সহজ শ্রদ্ধা ছিল। সে শুধু কবি বলিয়া নয়, মানুষ বলিয়া। তাহাকে কেহ কখনো তরল হইতে দেখে নাই।

কাজেই হারুন যখন উল্‌ঝলুল্‌কে মৃদু হাসিয়া নারী নায়িকা কেন, জিজ্ঞাসা করিল, উল্‌ঝলুল্‌ তখন তাহার নির্বিকারত্বের বাঁধুনি একটু শিথিল করিল।

সে বলিল, 'আমি জানি, নারী মাত্রই নায়িকা। ওরা প্রত্যেকে প্রতিদিন গল্প আর উপন্যাস সৃজন করে চলছে। ... তবে বড্ডো বজ্জ আঁটুনি—অবশ্য গেরো ফস্কা। কত 'চোখের বালি', কত 'ঘরে বাইরে', কত 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' সৃষ্টি করছে নারী, তার কটাই বা তোমাদের চোখে পড়ে কবি। ... যে-কোনো মেয়েকে দুটো দিন ভালো করে দেখ, দেখবে লক্ষ্মী-পক্ষী ইত্যাদি চতুর পুরুষের দেওয়া যতসব বিশেষণ কোনোটাই তাকে মানায় না। তবে, নারী বেচারি সংস্কার আর সমাজের খাতিরে সে যা নয়—তাই হবার জন্যে আমরণ সাধনা করছে। সে যুগ যুগ ধরে চতুর পুরুষের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে পুরুষকে খুশি করছে। পুরুষ কিন্তু দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে উঠে বেড়াচ্ছে এবং নারীকে শিখাচ্ছে দাঁড় ও ছোলা কলার মহিমা। সামনে সামনে বোঝা-পড়া হলে নারীকে দেখত শুধু নায়িকা রূপেই। তোমরা নারীকে দেখ, সে যা হলে ভালো হয়—তাই করে আর আমাদের মতো নিরেট মানুষে দেখে, নারীকে সে যা আছে—তার এক চুলও অতিক্রম না করে। তোমরা যারা নারীকে পূজা কর, আমার এ নির্মমতায় হয়তো ব্যথা পাবে, কিন্তু আমি নারীকে পূজা না করলেও অশ্রদ্ধা করিনে এবং শ্রদ্ধা হয়তো তোমাদের চেয়ে বেশিই করি। কিন্তু তাকে অতিরিক্ত অলঙ্কার পরিয়ে সুন্দর করে—সিঁদূর-কঙ্কণ পরিয়ে কল্যাণী করে নয়। আমি সহজ নারীকে, নিরাভরণাকে করি বন্দনা। রাঙতার সাজ পরিয়ে নারীকে দেবী করবার সাধনা আমার নয়। তিন হাত নারীকে বারো হাত শাড়ি পরিয়ে বিপুল করে, বাইশ সের লুৎফুন্নিসাকে হীরা জহরত সোনাদানা পরিয়ে এক মণ ভারাক্রান্ত করে—নারীকে প্রশংসা করার চাতুরী আমার নয়! তোমরা হয় তো চটবে, কিন্তু আমি বলি কি জান? আমি চাই রূপের মোমতাজকে। তাজমহল দিয়ে মোমতাজকে আড়াল করার অবমাননা আমাকে পীড়া দেয়। আমার ক্ষমতা যদি থাকত, এই বন্দনাগার হতে মোমতাজকে আমি মুক্তি দিতাম। কবরের ভিতর যদি শান্তি থাকে, তবে 'জাহানারা' 'মোমতাজ' বেচারির চেয়ে অনেক শান্তিতে আছে। জাহানারার কবরের শপ্পআচ্ছাদনকে মানুষের অহঙ্কার দলিত করেনি, কোনো পাষাণ-দেউল তার বুকে বসে তার বাইরের আকাশ আলোকে আড়াল করে দাঁড়ায়নি! ...'

সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল এই আধ-পাগলের প্রলাপ। কে একজন বলিয়া উঠিল, পাগলের পাগলামিতেও মাঝে মাঝে মানে থাকে! উল্‌ঝলুল্‌ জোরে-সোরে সিগারেট টানিয়া নিমেষে প্রায় দেড়টা সিগারেট পুড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল—

'দেখ মানুষ যা নয়, সেই মিথ্যা অভিষিক্ত করে তাকে খুব শ্রদ্ধা দেখাচ্ছ বলে তোমরা খুব বাহ্‌বা নিতে পার, কিন্তু আমার শ্রদ্ধা করার ধারা অন্য রকম। মানুষের—তা সে নর হন আর নারীই হন—যা আছে তাই নিয়েই তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার, সম্মান দেখাবার শক্তি ও সাহস আমার আছে। আমার মন অন্তত অতটুকু তৈরি হয়েছে।—শয়তান সৃষ্টি করা সত্ত্বেও আমি স্রষ্টাকে সম্মান করি। তোমরা শয়তানের

নিন্দা করে স্রষ্টার ওপর 'সেন্সার মোশন' আন, প্রকারান্তরে তাঁর সৃষ্টির দোষ ধরে সমালোচনা কর, আমি তা করিনে—এই যা তফাৎ। তোমরা নারীকে দেবী বলে এই কথাটাই পাকে-প্রকারে স্মরণ করিয়ে দাও যে, সে আসলে মানবী—দেবী হলেই তাকে মানায় ভালো! নারীকে এ অবমাননা করবার দুর্মতি আমার যেন কোনো দিন না হয়।'

তমিজ এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহে নাই। সে অতিমাত্রায় রুচিবাগীশ। এই জন্য সকলে তাহাকে বেতমিজ বলিয়া ক্ষেপাইত। তাহার আদর্শ ছিল নামানন্দ ও তুষ্ণীকুমার বাবু। উল্‌ঝলুল্‌কে সে সহিতে পারিত না। সে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল, 'বাবা পাগল-গাজি, তুমি থাম! তোমার আর বক্তিমে দিতে হবে না। তোমার মতো বিশ্ববখাটে ছেলের আদর্শ নিয়ে জগৎ চলছে না আর চলবেও না।'

উল্‌ঝলুল্ হাসিয়া বলিল, 'ভাই বেতমিজ! চটছ কেন? আমি তো তোমার 'সাধারণ ব্রাহ্ম মন্দিরে' বা 'দেবালয়ে' গিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিনে। তোমার গুরুর আর তোমাদের মতন আদর্শবাদীর ন্যাকামি আর মিথ্যাচার অসহ্য বলেই তো এত ঘা দিই। শয়তানের ওপর আমার কোনো আক্রোশ নেই, কেননা সে যা-তা সে লুকোয় না, তাকে চিনতে কারুর বেগ পেতে হয় না। কিন্তু ভেতরের কড়া-ক্রান্তি-হিসাবরত স্বার্থপর মুদিওয়ালা ও বানিয়াকে যখন বাইরের আচার্যের দাড়ি দিয়ে ঢাকতে যাও, তখনই আমি আসি ঐ পরদাড়ির মুখোশ খুলে তার ভেতরের বীভৎস কদর্যতা সকলের সামনে তুলে ধরতে। অবশ্য, তার জন্য আমাকেও অনেকটা নিচে নেমে যেতে হয়। কিন্তু যাক, তোমার রুচিবিকারের ভণ্ডামি আর ন্যাকামি নিয়ে আলোচনা করবার যদি দরকার হয় আর একদিন করব। আমাদের যে আলোচনা চলছিল—তাই চলুক।'

হারুন বলিল, 'তুমি কি বলছ, নারীর আর যত রূপ মিথ্যা? সেবিকা, প্রীতিময়ী, স্নেহময়ী—এসব রূপ তার ছলনা? এ মূর্তি সে নিয়েছে তার পুরুষের স্তুতি আর বন্দনার প্রতিদানে কিংবা তা আরো পাবার লোভে? অথবা তাকে এ সাজে সাজিয়েছে ঈর্ষাতুর পুরুষ? তাকে অবগুণ্ঠন পরিয়েছে পুরুষ, মানি—কিন্তু সে তো তাকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যেই। নারীকে ঘোমটার আড়াল করে দাঁড় করিয়েই তো তাকে পাবার নেশা বাড়িয়ে দিয়েছে হৃদয়ের। এই আড়ালই কাব্য সৃষ্টি করছে। যক্ষকে চিত্রকূটের আড়াল না দিলে কি মেঘদূত-এর সৃষ্টি হত? সীতাকে রাবণ হরণ না করলে কি রামায়ণ পেতাম? দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ কৌরবেরা করেছিল বলেই মহাভারতের মহাদানে আমাদের পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

উল্‌ঝলুল্ পুঞ্জিভূত ধূম্র নাসিকা ও মুখ-গহ্বর দিয়া উদ্‌গিরণ করিয়া আরো বলিবার আয়োজন করিতেই চা, গুড়ের সন্দেশ এবং লুচি আসিয়া হাজির হইল।

দেখা গেল, যুবকদের কাছেও নারী অপেক্ষা গুড়ের সন্দেশ অনেক মিষ্টি এবং লুচি ও চা ঢের ঢের প্রিয়। গুড়ের সন্দেশ ও লুচিতে নারী ডুবিয়া গেল। তাহাদের খাইবার ধরন দেখিয়া মনে হইল, যেন বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অথবা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-ফেরৎ একদল বুভুক্ষ। কুম্ভীর মিয়া এক গালে এক ডজন লুচি ও একগালে এক ডজন গুড়ের সন্দেশ পুড়িয়া মুখ সঞ্চালনবিদ্যার যে অদ্ভুত আর্ট দেখাইতেছিল, তাহা দেখিয়া

কেহ হাসিতেছিল—কেহ ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিবার মন্ত্র করিতেছিল, আর যাহারা রাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাদেরি মধ্যে একজন খানিকটা নস্য লইয়া কুম্ভীর মিঞার নাকে ঠাসিয়া দিল। কুম্ভীর মিঞা নস্য লইত না। অতএব ইহার পর যে বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা না বলাই ভালো। তাহার মুখ-গহ্বর হইতে লালা-মিশ্রিত সমস্ত লুচি ও সন্দেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় সকলের অঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিল। খাওয়া রহিল পড়িয়া, লাফাইয়া যে যেখানে পারিল পলাইল। কিন্তু কুম্ভীর মিঞার হাঁচি আর থামে না। হাঁচিতে, কাঁশিতে, লালাতে, সিক্‌নিতে মিশিয়া একটা বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হইয়া গেল। বিকচ্ছ ও প্রায় দিগ্‌বসনা কুম্ভীর মিঞার ভুঁড়ি হাঁচির বেগে প্রবল বেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল,—স্টিমার পার হইয়া যাইবার পর গঙ্গা-বক্ষের বয়া যেমন করিয়া দুলিতে থাকে। চক্ষু ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মতো হইয়া উঠিল। হাঁচিনিষিক্ত নাসিকা দেখিয়া মনে হইল, যেন কর্তিত খেজুরগুঁড়ি দিয়া রস চোঁয়াইতেছে। কেহ তাহার মাথায়, কেহ বা ভুঁড়িতে বদনা বদনা পানি ঢালিতে লাগিল। তারিক 'সূরা ইয়াসিন' পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। 'সুরা ইয়াসিন' অন্তিম সময়েই শুনাইয়া থাকে এবং 'আজান' নামাজের সময় ব্যতীত অন্য সময় দিলে সাধারণত লোক মনে করিয়া থাকে—কাহারও বাড়িতে সন্তান হইয়াছে। সুতরাং তারিকের 'সুরা ইয়াসিন' পড়াতে যত না হাসির সৃষ্টি হইল, আমজাদ তাড়াতাড়ি কাছা খুলিয়া প্রাণপণ চিৎকারে আজান দিতে শুরু করায় সকলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল!

মোটের উপর যদি কোনো মাতাল এটাকে একটা তাড়িখানা মনে করিয়া ঢুকিয়া পড়িত তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া চলিত না।

এইবার কুম্ভীর মিঞার রাগিবার পালা। রাগাইয়া গালি খাওয়া মুখরোচক বটে, তবে তাহা লুচি ও গুড়ের সন্দেশ নয়। কাজেই, তাহা গলধঃকরণ করিতে অনেকেরই যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। কিন্তু থাক, আর নয়। মেসে এ-সব ব্যাপার কিছু নতুন নয়।

আড্ডা যখন ভাঙিল, তখন রাত্রি পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

বাবুর্চি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যে-যা পারিল দু'টা মুখে গুঁজিয়া দিয়া আপন আপন সিটে লম্বা হইয়া পড়িল।

ঘুম আসিল কিনা বলিতে পারি না, কেননা হপ্তাখানিকের মধ্যেই গ্রীষ্মের ছুটি। প্রায় সব কলেজই বন্ধ হইয়া যাইবে।

শুইয়া শুইয়া তরুণেরা গ্রীষ্মের আর পূজার ছুটির আগে যে-সব কথা ভাবে, তাহা আন্দাজ করিলে—তরুণেরা যাই হউন, রুচি-বাগীশ কুঞ্চিত-নাসিকার দল খুশি হইবেন না। তাঁহারা ভাবিতে পারেন, ছেলেরা সে সময় ভগবৎচিন্তা করে মনে মনে। ইহাও হয় ত বলে—যেন, খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙিয়া যায়—সে ফজরের নামাজ পড়িবে। তাঁহাদের এরূপ ভাবায় সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু তরুণেরা তাহা ভাবে না। সকলের কথা বলিতে পারি না, তবে অধিকাংশ তরুণই সে সময় আম-তাল, পুকুর-

ঘাট, নদীর পাড় এবং আনুষঙ্গিক মধুর আরো কিছুর স্মৃতি-এই সবই হয় তো বিশেষ করিয়া ভাবে।

কাজেই ঘুম সে রাত্রে কাহার আসিল জানি না ; অন্ততঃ উল্‌ঝলুল্ ও হারুনের আসে নাই।

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন যে কামরাটি এবং যাহাতে একটি মাত্র সিট ছিল, সেই কামরাটিতে উল্‌ঝলুল্ একা থাকিত। আড্ডা যখন ভাঙিয়া গেল এবং মেস শান্ত হইল, তখন হারুন তাহার তক্তা প্যাটরা টানিয়া উল্‌ঝলুলের স্বল্পায়তন কামরাটির অবকাশটুকু ভরাট করিয়া ফেলিল। উল্‌ঝলুল্ প্রায় গোপাল-কাছা হইয়া চিৎপটাং দিয়া শুইয়া ধূম্র-মার্গে বিচরণ করিতেছিল। সে হারুনের তক্তা টানার ঘেষ্‌ড়ানিতে সচকিত হইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া হারুনের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল। দেখিয়া খুব বেশি বিস্মিত হইল বলিয়া মনে হইল না। একরাশ উচ্ছৃঙ্খল কেশের গুচ্ছ ললাট হইতে তুলিয়া সে একটু হাসিল মনে হইল। হারুনও তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাসিল।

বাহির তখন শব্দহীন। ক্বচিৎ মোটরের চাকার ঘর্ঘরধ্বনি সেই শব্দহীন অতলতায় নিমেষের জন্য চঞ্চলতার দোলা দিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল,—নিশীথরাতে তীরের তরুশাখা হইতে একটি ছোট্ট ফল পাড়িয়া দীঘির নিশ্চলতায় যেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আকাশে অগণিত নক্ষত্র ফেনাইয়া উঠিতেছিল ছায়াপথের কূলে কূলে। ওরা যেন জ্যোতির্ভ্রমর, আকাশ যেন নীলোৎপল, চাঁদ যেন তাহার পদ্ম-চাকী।

নীরব-নিস্পন্দ জগৎ। রাতের চোখে নিদ্রা যেন জড়াইয়া ধরিয়াছে। এমনি নীরব নিশীথে যদি হৃদয়ের সান্নিধ্যে হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়, তবে সে নিশীথ যেন জীবনে আর না কাটে।

কলিকাতার সকল রাজপথ সকল অলিগলির ধূলা-কাদা পায়ে লাগিয়াছে বলিয়াই হতভাগা জাহাঙ্গির আজ উল্‌ঝলুল্ নামের বিদ্রূপ-তিলক পরিয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের ভস্মরাশির মধ্য হইতে মানুষকে টানিয়া বাহির করিবার—বাঁচাইবার দুরন্ত সাধনা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে বলিয়া, সত্যকে দর্পণের মতো হাতে ধরিয়া দেখিতে চায় বলিয়া সে আজ রুচিবাগীশ নীতিকচকচিদের ঘৃণার বক্র-ইঙ্গিত সহিয়া যাইতেছে। হারুনের চোখে জল আসিল। সে কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। সে হঠাৎ উল্‌ঝলুল্‌কে স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওগো সত্যব্রত, ওগো বেদনা-সুন্দর, ওগো পাগল, তোমায় সালাম, হাজার বার সালাম, করি'—উল্‌ঝলুল্ তখন অঘোরে ঘুমাইতেছে।

বাহিরে তাকাইয়া হারুনের মনে হইল সারা আকাশ বাতাস যেন ঘুমাইয়া চাঁদের স্বপন দেখিতেছে। পবিত্র শান্তিতে তাহার হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া গেল। সে ঘুমের ক্ষীরসাগরে ডুবিয়া গেল।

আকাশ, চন্দ্র ও তারকা সাক্ষী রহিল... আজ একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভ করিল—শুধু হাসি বদল করিয়া ...

ধরা আজ সুন্দরতর হইল !

দুই

মেসে যা-ই বলিয়া ডাকুক, আমরা উল্‌ঝলুল্‌কে জাহাঙ্গির বলিয়াই ডাকিব।

জাহাঙ্গিরের পৈতৃক বাড়ি কুমিল্লা জেলায়। তবে সে কলিকাতায় থাকিয়াই মানুষ হইয়াছে। তাহার পিতা ছিলেন কুমিল্লার একজন বিখ্যাত জমিদার ও মানীলোক। বৎসর চারেক হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সে-ই এখন তাহার বিপুল জমিদারির উত্তরাধিকারী। তবে তাহার মাতা আজো জীবিতা, এবং জমিদারি পরিচালনা করেন তিনিই। তাহার জমিদারি পরিচালনের অতিদক্ষতা দর্শনে লোকে নাকি বলাবলি করে যে, মেয়েরা সুযোগ পাইলে জমিদারি তো চালাইতেই পারে, কাছা আঁটিয়া ঘোড়ায়ও চড়িতে পারে। তাহার শাসনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল না খাক, তাহার জমিদারির বড় বড় রুই-কাতলা ও চুনোপুটি এক জালে বদ্ধ হইয়া একসাথে নাকানি-চুবানি হইয়াছে। হিন্দু প্রজারা তাহাকে বলিত 'রায়বাঘিনী' এবং মুসলমানেরা বলিত 'খাড়ে দজ্‌জাল' (খরে দজ্‌জাল)!

জাহাঙ্গিরের পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাহার পিতামাতা বৎসরের অধিকাংশ সময় কলিকাতাতেই কাটাইয়াছেন। তাহাদের দু-চারখানা বাড়িও ছিল কলিকাতায়। কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর পর জাহাঙ্গিরের মাতা সে সমস্ত ভাড়া দিয়া ছেলেকে বেকার হোস্টেলে রাখিয়া নিজে জমিদারি দেখিতে কুমিল্লা চলিয়া যান।

জাহাঙ্গিরের ধাতে কিন্তু হোস্টেলের জেল কয়েদির জীবন সহিল না। সে হোস্টেল ছাড়িয়া মেসে আসিয়া আস্তানা গাড়িল।

ইচ্ছা করিলে সে হয়তো আলাদা বাসা বাঁধিয়াই থাকিতে পারিত, কিন্তু কেন যে তাহা করিল না, তাহা তাহার বিধাতাপুরুষই জানেন। সে মাসে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলেও হয়তো তাহার মাতা বিশেষ আপত্তি করিতেন না, তাঁহার অপত্য-স্নেহ এতই প্রবল ছিল ; কিন্তু জাহাঙ্গির কোন মাসে একশত টাকার বেশি খরচ করিয়াছে, এ বদনাম স্টেটের অতি কৃপণ দেওয়ানজিও দিতে পারেন নাই। ইহাতে জাহাঙ্গিরের মাতা খুশিই হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার খাওয়া-পরার অতিমাত্রায় সাধাসিধে ধরন তাঁহাকে পীড়া দিত। অত বড় স্টেটের ভাবী মালিক, সে যদি সংসারে এমনই বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে এবং এমন মুসাফিরি হালে চলাফেরা করে, তবে কাহার জন্য এ পণ্ডশ্রম? কিন্তু ইহা লইয়া পুত্রকে অনুরোধ বা অনুযোগ করা বৃথা। তাঁহার উপরোধ বা আদেশে জাহাঙ্গির বরং ঢেঁকি গিলিবার চেষ্টা করিবে, তবু তাহার চলাফেরার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না।

বহুদিন হইতেই জাহাঙ্গিরের চোখে মুখে, চলাফেরায়, কঠিন জীবন-যাপনের মধ্যে মাতা এই বিরস ঔদাসীন্য, বেদনাক্ত অশ্রদ্ধা দেখিয়া আসিতেছেন এবং তিনি তাহার কারণও জানিতেন, তাই মা হইয়াও তিনি পুত্রকে দস্তুরমতো ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি যেন পুত্রের কেউ নন। মাতা-পুত্রের মধ্যে এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি ইতিপূর্বেই হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু জাহাঙ্গির এখন আর বাহিরের দিক দিয়া সহজে তাহা ধরা

পড়িবার অবকাশ দেয় না। সে বলে, 'কি করব মা, আমার স্বভাবই এই, কিচ্ছু ভালো লাগে না যেন।' সে বলে বটে হাসিয়াই, কিন্তু তাহার পীড়িত মনের ছাপ মুখের মুকুরে ধরা পড়ে।

জননী অশ্রু সংবরণ করিয়া উঠিয়া যান। তাঁহার এ দুর্বলতার একটু ইতিহাস আছে।

জাহাঙ্গির যখন জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া সবে মাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে শিখিয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে শুনিল, তাহার মাতা কলিকাতারই একজন ডাকসাইটে বাইজি এবং তাহার পিতা চিরকুমার। সে তাহার পিতামাতার কামজ সন্তান।

সেই দিন হইতে তাহার চোখে সুন্দর পৃথিবীর রঙ বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনের আনন্দ-দীপালিকে যেন থাবা মারিয়া নিভাইয়া দিয়াছে। সে মানুষের জীবনের অর্থ নূতন করিয়া বুঝিবার সাধনা করিতেছে!

সে তাহার আদর্শবাদের কাঁচ দিয়া বাসি পৃথিবীকে সাত-রঙা করিয়া দেখিয়াছে, সহজ মানুষকে আপন-মনের মাধুরী দিয়া বিচিত্রতর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু আজ সে উদ্যত দণ্ড বিচারকের মতো নির্মম, সে বারবিলাসিনীর মতো ব্যবসাদারী সাজসজ্জার ভণ্ডামির জন্য শাস্তি দিবে!

নিষ্ঠুর বজ্রালোকে আজ সত্যের সহিত তাহার মুখোমুখি পরিচয় হইয়া গিয়াছে। আজ সে কঠোর বাস্তব-ব্রতী।...

তিন

তখন স্বদেশী যুগের বান ডাকিয়াছে। ইংরেজ তাহার রাজত্ব ভাসিয়া যাওয়ার ভয় না করিলেও ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কা একটু অতিরিক্ত করিয়াই করিতেছিল। ঘরের ঘটিবাটি সে সামলাইতেছিল না বটে, কিন্তু বাঁধ সে ভালো করিয়াই বাঁধিতেছিল। জাহাঙ্গির তখনও বালক,—স্কুলে পড়ে। এমনি দিনে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' মন্ত্রে এই কল্পনা-প্রবণ কিশোরকে দীক্ষা দিলেন তাহারই এক তরুণ স্কুল-মাস্টার প্রমত্ত। প্রমত্ত যে বিপ্লববাদী, এ ভীষণ সংবাদ স্কুলের কয়েকটি বিপ্লবপন্থী ছাত্র ব্যতীত হয়তো বিধাতাপুরুষও জানিতেন না। তবে সি.আই.ডি. প্রভু জানিতেন কিনা, বলা দুষ্কর। বিধাতা-পুরুষে আর সি.আই.ডি. মহাপুরুষে এইটুকু তফাৎ। যাহা পূর্বোক্ত পুরুষের অগোচর, তাহা শেষোক্ত মহাপুরুষের নখদর্পণে!—একদিন একটি ছাত্র গান করিতেছিল—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে!'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'এ গান কাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, জানিস?' ছেলেটি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, 'কেন স্যার, ভগবানকে উদ্দেশ করে।' প্রমত্ত

ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু, তুই জানিসনে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীমৎ টিকটিকি বাবাজিকে স্মরণ করে ভক্তিভরে এ-গান রচনা করেছিলেন।' ছেলেদের উৎসাহ দেখে কে! সেইদিন হইতে কাহাকেও টিকটিকি বলিয়া সন্দেহ হইলেই, এমনকি দেওয়ালে টিকটিকি দেখিলে, তাহারা তারস্বরে গাহিত,—

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে!'

প্রমত্তকে ছাত্রদের সকলে শ্রদ্ধা করিত, ভালোবাসিত—ভালো শিক্ষক বলিয়াই নয়, সে সকলকে অন্তর দিয়া ভালোবাসিতে জানিত বলিয়া। উঁচু ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্রই তাহাকে প্রমত্-দা বলিয়া ডাকিত।

প্রমত্তের—একা প্রমত্তের কেন, যে-কোনো বিপ্লবনায়কেরই—কোনো কার্যের কারণ জিজ্ঞাসার অধিকার কোনো বিপ্লববাদীরই ছিল না, তবুও তাহারা প্রমত্তের জাহাঙ্গিরকে 'মাতৃমন্ত্রে' দীক্ষা দেওয়া লইয়া একটু চড়া রকমেরই প্রতিবাদ করিল। প্রমত্ত কোনো বড় দলের নায়ক ছিল না। তবুও তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিবার সাহস বড় বড় বিপ্লবনায়কদেরও হয়নি। ভবিষ্যতে প্রমত্ত একজন বড় বিপ্লবনায়ক হইবে, এ-ভয়ও দলের ছোট-বড় সকলেই করিত। সুতরাং এ-প্রতিবাদের উত্তর সে তাহারই অধীন বিপ্লববাদীদের না দিলেও পারিত, কিন্তু লোকটি আসলে ছিল একটু বেশি রকমের ভালো মানুষ। কাজেই নিয়ম-বিরুদ্ধ হইলেও সে ইহা লইয়া বেশ একটু তর্ক করিল। বলিল, 'দেখ, আমাদের অধিনায়ক বজ্রপাণি মহাশয়কে আমি আমার ভগবানের চেয়েও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর এ-মতকে মানতে যথেষ্ট ব্যথা পাই যে বাংলার মুসলমান ছেলে বিপ্লববাদীদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য, তাঁর স্পষ্ট নিষেধ থাকলে আমি জাহাঙ্গিরকে এ-দলে নিতে পারতাম না। তা সে যত ভালো ছেলেই হোক। তোমরা বলবে, অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই হয় চাকুরী-লোভী, নাহয় ভীরু। কিন্তু ওদের সব ছেলেই যে ঐ রকমের, তা বিশ্বাস করবার তো কোনো হেতু দেখিনে। তাছাড়া, আমরা ওদের চেয়ে কম চাকুরী-লোভী, কম ভীরু—এ বিশ্বাস করতে আমার লজ্জা হয়। দেশপ্রেম ওদের মধ্যে জাগেনি—ওদের কেউ নেতা নেই বলে। আর, ধর্ম ওদের আলাদা হলেও এই বাংলারই জলবায়ু দিয়ে তো ওদেরও রক্ত-অস্থি-মজ্জার সৃষ্টি। যে শক্তি যে তেজ যে ত্যাগ তোমাদের মধ্যে আছে, তা ওদের মধ্যেই বা থাকবে না কেন? তাছাড়া আমি মুসলমান ধর্মের যতটুকু পড়েছি, তাতে জোর করেই বলতে পারি যে, ওদের ধর্ম দুর্বলের সান্ত্বনা 'অহিংসা পরমধর্ম'কে কখনো বড় করে দেখেনি! দুর্বলেরা অহিংসার যত বড় সাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই দিক না কেন, ও জিনিসটে মুসলমানেরা অভ্যাস করেনি বলে ওতে ওদের অগৌরবের কিছু নাই।

'আজ-কাল একদল অতিজ্ঞানী লোক বীর-ধর্ম রাজসিকতাকে বিদ্রূপ করে তাদের কাপুরুষতার তামসিকতাকে লুকোবার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করি—শুধু কি বুদ্ধ, খ্রিস্ট, নিমাই-ই বেঁচে আছেন বা থাকবেন? রাম, কৃষ্ণ, অর্জুন, আলেকজান্ডার, প্রতাপ, নেপোলিয়ন, গ্যারিবলডি, সিজার—এঁরা কেউ বেঁচে নেই বা থাকবেন না? কত ব্যাস-বাল্মিকী-হোমার অমর হয়ে গেলেন এই গাথা লিখেই।

তোমরা হয়তো বলবে, অনাগত যুগে এদের কেউ বড় বলবে না, কিন্তু তোমাদের সে অনাগত যুগ আসতে আসতে পৃথিবীর পরমায়ু ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়া সাত্ত্বিক ঋষিরা, অহিংস কবিরা অনাগত যুগের অবতারের যে কল্কি বা মেহেদি মূর্তির কল্পনা করেছেন, তাকে তো নখদন্তহীন বলা চলে না। যাক, কি বলতে কি সব বলছি। দ্যাখ, নেংটি-পরা বাবাজিদের এই অহিংসবাদ আমায় এত আহত করে তোলে যে তখন আর আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না! আমি বলছিলাম কি—'

ইহারই মধ্যে একটি টলস্টয়-ভক্ত ছেলে বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু প্রমত-দা, আমরা মার খেয়েই মারকে জয় করব—এ কি একেবারে মিথ্যা?'

প্রমত্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল, 'তা, হলে আমরা বহুদিন হল জয়ী হয়ে গেছি! কারণ, আমরা নির্বিকার চিত্তে এত শতাব্দী ধরে এত মার খেয়েছি যে, যারা মেরেছে তারাই শেষে দিকশিক মেরে গেছে। আমাদের আর্য মেরেছে, অনার্য মেরেছে, শক মেরেছে, হুন মেরেছে! আরবি ঘোড়া মেরেছে চাট, কাবলিওয়ালা মেরেছে গুঁতো, ইরানি মেরেছে ছুরি, তুরানি হেনেছে তলওয়ার, মোগল-পাঠান মেরেছে জাত, পর্তুগিজ-ওলন্দাজ-দিনেমার-ফরাসি ভাতে মারতে এসে মেরেছে হাতে, আর সকলের শেষে মোক্ষম মার মেরেছে ইংরেজ। মারতে বাকি ছিল শুধু মনুষ্যত্বটুকু-যার জোরে এত মারের পরও এ-জাত মরেনি—তাই মেরে দিলে ইংরেজ বাবাজি! এত মহামারীর পরও যদি কেউ বলেন—'আমরা এই মরে মরেই বাঁচছি', তবে তাঁর দর্শনকে আমি শ্রদ্ধা করি--কিন্তু বুদ্ধিকে প্রশংসা করিনে। তাঁর বুদ্ধি-স্থানের ভালো করে চিকিৎসা হওয়া উচিত। যাক, এ নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। আমি বলছিলাম, সত্যিই কি আমাদের এ আন্দোলন থেকে মুসলমানদের বাদ দেবো? ওদের অনেক দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু ওরা সরল-বিশ্বাসী ও দুঃসাহসী! ওদের হাতে বাঁশ আছে সত্যি, কিন্তু তা ওরা পেছনে লুকিয়ে রাখতে জানে না, একেবারে নাকের ডগায় উঁচিয়ে ধরে—এই যা দোষ। ওতে আমাদের কাজ হয় না। ওদের গুপ্ত-মন্ত্রে দীক্ষা দিলে হয়তো ভাবীকালে সেরা সৈনিক হতে পারত।'

প্রমত্ত কি যেন ভাবিতে লাগিল। মনে হইল, ভাবীকালের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সে ক্ষীণ দীপশিখা লইয়া কি যেন হাতড়াইয়া ফিরিতেছে!

জাহাঙ্গিরের প্রিয়বন্ধু অনিমেষ বলিয়া উঠিল, 'প্রমত-দা, জাহাঙ্গিরকে আমাদের দলে নেওয়ায় অন্তত আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভেবে দেখেনি। তাকে আমি দেখেছি মানুষ হিসাবে। সে হিসাবে সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়। কিন্তু এ নিয়ে শেষে আমাদের মধ্যে একটা মনান্তর না বাধে। আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামিকে আজো পেরিয়ে যেতে পারিনি—ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি। এর জন্যে দায়ী আমাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক বিপ্লব সঙ্ঘের অধিনায়ক। আপনি বোধ হয় বুঝেছেন প্রমত-দা, আমি কাকে মনে করে এ-কথা বলছি!' প্রমত্ত ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিল। অনেকেই সে-হাসির অর্থ বুঝিল না।

অনিমেষ বলিয়া যাইতে লাগিল, 'তিনি এবং তাঁর দল কি বলেন, জানেন? বলেন—'আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গি এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে! সন্ধি করব লন্ডন এবং মক্কা অধিকার করে!—তারা মুসলমানকে ইংরেজের চেয়ে শত্রু মনে করে না।'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'আর ঐ অধিনায়ক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করে বিলেত ও মক্কা থেকে কি আনবেন—বলতে পারিস?'

ছেলেরা একবাক্যে স্বীকার করিল, তাহারা বলিতে পারে না।

প্রমত্ত বলিল, 'তিনি বিলেত গেলে হয়ে আসবেন ট্যাসু, খেয়ে আসবেন হ্যাম, নিয়ে আসবেন মেম। আর মক্কা গেলে হয়ে আসবেন হাজি, খেয়ে আসবেন গোশত এবং নিয়ে আসবেন দাড়ি! সন্ধিপত্র আর আনতে হবে না!'

ছেলেরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। প্রমত্ত বলিয়া যাইতে লাগিল, 'দেখ, এই বাংলাদেশে গাঁজার চাষ করে গভর্নমেন্ট তত সুবিধে করতে পারেনি, যত সুবিধে তাদের করে দিয়েছে আমাদের মহাপুরুষেরা আমাদের মস্তিষ্কে ধর্মের চাষ করে, আমাদের দাঁতের গোড়া ভাঙবার জন্যে ইংরেজের শিল নোড়া হয়ে উঠেছে আমাদের ধর্ম।—ইংরেজের ভারত-শাসনের বড় যন্ত্র কি, জানিস? আমাদের পরস্পরের প্রতি এই অবিশ্বাস, পরস্পরের ধর্মে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা। এই ভেদনীতিই ইংরেজের বুটকে ভারতের বুকে কায়েম করে রাখলে—'আদমস্ পিকে' আদমের পদচিহ্ন যেমন অক্ষয় হয়ে রইল।'

সমরেশ একটু অতিরিক্ত হিন্দু। সে বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা প্রমত-দা, মুসলমানকে বাদ দিয়েও তো আমরা স্বাধীন হতে পারি।'

প্রমত্ত বলিল, 'নিশ্চয়, অনেক দেশই তাদের স্বদেশবাসীর অন্তত বারো আনা লোকের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু আমরা তা পারব না। কেউ যদি পারে ইংরেজ ও মুসলমানকে একসাথে তাড়াতে, তাড়াক। অন্তত আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। তবে অন্য যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, তারা স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করেছিল—তাদের তাড়াবার পাগলামি তো তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। যে বিপ্লবাধিপ বলেন—'আগে মুসলমানকে তাড়াতে হবে, তিনি ভুলে যান যে তাঁর এ অতিক্ষমতা বাদ থাকতেও, তাহলেও চতুর ইংরেজ প্রাণ থাকতে তা হতে দিত না। যে-দিন ভারত একজাতি হবে সেইদিন ইংরেজকেও বোঁচকা-পুঁটলি বাঁধতে হবে। একথা শুধু যে ইংরেজ জানে তা নয়, রামা শ্যামাও জানে। 'হিন্দু' 'মুসলমান' এই দুটো নামের মন্ত্রৌষধিই তো ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার রক্ষাকবচ। ... আমার মনে হয় কি, জানিস? ইচ্ছা করলে আমরা অনায়াসে এদেশের মুসলমানদের জয় করতে পারি। তবে তা তরবারি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। অন্তত একটা স্থূল রকমের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে ওদের পরিচিত না করে তুললে, 'কালচার'-এর সংস্পর্শে না আনলে ওদের জয় করতে পারব না। ওদের জয় করা বা স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা মানেই ইংরেজের হাতের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া!'

সমরেশ বলিল, 'কিন্তু প্রমত-দা, ওদের গোয়ার্তুমি আর আবদারের যে অন্ত নেই। মানি, ওরা ইংরেজের হাতের অস্ত্র, আমরা দেশের কিছু করতে গেলেই মামারা দেবে ওদের লেলিয়ে! কিন্তু উপায় কি? 'কনসেশন' দিয়ে দিয়ে ওদের তৃতীয় রিপুটাকে প্রচণ্ড করে তোলায় আমাদের যা হবার তা তো হবেই, ওদের নিজেদেরও চরম অকল্যাণ হবে। ওরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কোনোদিনই করবে না!'

প্রমত্ত, 'কনসেশন আমি দিতে বলিনে। আমিও বলি, সমরযাত্রার অভিযানের সাথী যদি খোঁড়া হয়, তবে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে পথে ফেলে যাওয়াই কল্যাণকর। কিন্তু অভিযান তো আমাদের শুরু হয়নি সমরেশ! এটা রিক্রুটমেন্টের কাঁচা সৈনিক সংগ্রহের যুগ—আমরা স্রেফ প্রস্তুত হচ্ছি বৈ-তো নয়। অনাগত অভিযানের সৈনিক ওরাও হতে পারে কিনা—তা পরীক্ষা করে দেখলে আমাদের দেশোদ্ধারের তারিখ এগিয়ে না যাক, অন্তত পিছিয়ে যাবে না। এখনই তুমি বলছিলে ওদের গোঁয়ার্তুমি আর আবদারের কথা। একথা একা তুমি নয়, আমাদের অনেক নেতাই বলছেন। কিন্তু রোগ নির্ণয় করলেই তো রোগের চিকিৎসা হয় না। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম—ওরা অতিমাত্রায় আবদেরে, ওরা হয়তো ইংরেজ রাজ্যটাকে মামাবাড়িই মনে করে। কিন্তু এর মূলে কতদিনের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা পুঞ্জিভূত হয়ে রয়েছে—তা দেখেছ কি? সেই কথাই তো বলছিলাম যে, এইগুলো আমাদের সাধনা দিয়ে, তপস্যা দিয়ে দূর করতে হবে। আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে ওদের মধ্যে ওদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যে, ওদের রক্তে স্বদেশ-প্রেম জাগিয়ে তোলার জন্যে। দেখবে, আজ যারা তোমার প্রতিবন্ধক, কাল সে তোমার সবচেয়ে বিশ্বাসী ও বড় সহযোগী হয়ে উঠবে। ওদের ঘৃণা করে ক্ষেপিয়ে না তুলে ভালোবেসে দেখতে দোষ কি?'

সমরেশ, কিন্তু প্রমত-দা, ওদের মোল্লামৌলবিরা তা কখনো হতে দেবে না। জানি না, হয়তো বা ওদের মৌলবিমোল্লা এবং আমাদের ধর্মধ্বজীরা ইংরেজের গুপ্তচর। ওরা তখন সাধারণ মুসলমানদের এই বলে ক্ষেপিয়ে তুলবে যে ওদের হিন্দু করে তোলার জন্যেই আমাদের এই অহেতুক মাথা-ব্যথা। আমাদের এ 'নিরুপাধিক' প্রেমচর্চাকে তারা বিশ্বাস করবে না, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করবে না।'

প্রমত্ত, 'আমি তাও ভেবে দেখেছি। জানি, মুসলমান জনসাধারণের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে মোল্লামৌলবির। তাদের রুটি মারা যাবে যাতে করে, তাকে তারা প্রাণপণে বাধা দেবেই। কিন্তু এ ভূতেরও ওঝা আছে,—সে হচ্ছে মুসলমান ছাত্রসমাজ। তরুণ মুসলিমকে যদি দলে ভিড়াতে পারি, তা হলে ইংরেজ আর মোল্লামৌলবি এ দুই জোঁকের মুখেই পড়বে চুন। এই জন্যই আমি বেছে মুসলমান ছাত্র নিতে চাই আমাদের দলে এবং এইখানেই আমার সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লব-নেতার বাধে খিটিমিটি।'

সমরেশ, 'আপনার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির প্রশংসা করি প্রমত-দা, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই জাহাঙ্গির তো নয়ই, জাহাঙ্গিরের ভূতও নয়। তারা মনে করে,

আমাদের স্বদেশি আন্দোলন মানে হিন্দুরাজের প্রতিষ্ঠা, কাজেই তারা এতে যোগদান করাকে মনে করে পাপ। তারাও সব হা-পিত্যেশ করে তীর্থের কাকের মতো আরব-কাবলু-ইরান-তুরানের দিকে চেয়ে আছে—কখন ঐ দেশের মিয়াসাহেবেরা এসে ভারত জয় করে ওদের ভোগ করতে দিয়ে যাবে। ওরা ভুলে যায় নাদির শা তৈমুরের কথা!'

প্রমত্ত, 'মুসলমানেরা যদি হিন্দুরাজের ভয় করেই, তাতে তাদের বড় দোষ দেওয়া চলে না সমরেশ। মাতৃ-সমিতির অধিনায়কদের মতো নাকি হিন্দুরাজেরই প্রতিষ্ঠা। তাদের এ-ভয় আমাদের আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও ত্যাগ দিয়ে দূর করতে হবে। নইলে পরাধীন ভারতের মুক্তি নেই। মাতৃ-সমিতির মতো আমাদের সঙ্ঘেও যদি ঐ মতো হত যে মুসলমানকে এ-দেশ থেকে তাড়াতে হবে, তা হলে দেশকে যতই ভালোবাসি না কেন, এ-সঙ্ঘে আমি যোগদান করতাম না। মুসলমানদের যদি কোনো দোষ ত্রুটি থাকেই, তবে তার সংশোধনের সাধনা করব। তাদের তাড়াবার পাগলামি যেন আমায় কোনো দিন পেয়ে না বসে। আর, ইরান-তুরানের দিকে যে ওরা চেয়ে আছে, তাতে ওদের খুব বেশি দোষ দেওয়াও চলে না। দুর্বল মাত্রেই পরমুখাপেক্ষী। নিজেদের শক্তি নেই, ওরা তাই অন্য দেশের মুসলমানদের পানে চেয়ে তাদের শক্তিহীনতার গ্লানিতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে ;—যদিও ওরা নিজেরাই জানে যে ওদের জন্যে ইরান-তুরান-আরব-কাবুল কারুরই কোনো মাথা-ব্যথা নেই। আমাদের সাধনা হবে—ওদের ঐ পরদেশমুখী মনকে স্বদেশের মমতা দিয়ে ভিজিয়ে তোলা। যে-মাটি ওদের ফুলে-ফলে-শস্যে-জলে জননীর অধিক স্নেহে লালন-পালন করছে, সেই সর্বংসহা ধরিত্রীর, মূক মাটির ঋণের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তাদের রক্তে এই মন্ত্র জ্বালা করে ফিরবে যে জননীর স্তন্যপানের যদি কোনো ঋণ থাকে, তবে তারও চেয়ে বড় ঋণ আমাদের দেশজননীর কাছে—যার জলবায়ু ও রসধারায় আমাদের প্রাণ-মন-দেহ অনুক্ষণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে—যে দেশ আমার পিতার জননী, আমার জননীর জননী! ... ওদের রক্তে এ-মন্ত্র ইনজেক্ট করতে পারবি তোরা কেউ সমরেশ? সে-দিন ভারতের যে রাজরাজেশ্বরী মূর্তি আমি দেখব, তা আমি আজো দেখছি—আজো দেখছি আমার মানস-নেত্রে। গা দেখি সমরেশ, অনিমেষ! শোনা আমায় সেই সঞ্জীবনীমন্ত্র! শোনা সেই গান—

'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ!'

প্রমত্ত চক্ষু বুঁজিল। তাহার মুদিত চক্ষু দিয়া বিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেরা তাহার পায়ের ধূলায় ললাট ছোঁয়াইয়া গাহিতে লাগিল—

'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ!'

গাহিতে গাহিতে তাহাদেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

প্রমত্ত সম্মুখে প্রসারিত ভারতবর্ষের প্রাণহীন মানচিত্রকে বারে বারে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে লাগিল!

সমরেশ প্রমত্তের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, 'এতদিন আপনাকে ভুল সন্দেহ করেছি প্রমত-দা, যে, হয়তো মুসলমানের প্রতি আপনার কোনো-একটা গোপন দুর্বলতা বা আকর্ষণ আছে। সত্যিই আমরা বিপ্লব-সেনা হবার অধিকারী হয়তো আজো হইনি, আজো আমরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের সকলকে ভালোবাসতে পারিনি। আমাদের দেশপ্রেম হয়তো স্রেফ উত্তেজনা, হয়তো ত্যাগের বিলাস। হয়তো আমরা গোঁড়ামিরই রক্ষী-সেনা-ধর্মের নবতম পাণ্ডা। আপনি ঠিকই বলেছেন প্রমত-দা, আমরা কেউই আজো দেশ-সৈনিক হতে পারিনি।'

অনিমেষ হাসিয়া বলিল, 'ঠিক বলেছে সমর, আমরা ধর্মের ষাঁড়—বিপ্লবদেবতার কেউ নই!'

প্রমত্ত চক্ষু মুছিয়া সিক্তস্বরে বলিল, 'আমার ভারত এ-মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম। আমি তোমাদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের জল-বায়ু-মাটি-পর্বত-অরণ্যকেই ভালোবাসিনি! আমার ভারতবর্ষ—ভারতের এই মূক-দরিদ্র-নিরন্ন পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়,—আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে-যুগে-পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ। কত অশ্রু সাগরে চড়া পড়ে পড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ! ওরে, ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরে ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের—মহা-মানুষের মহাভারত!'

চার

স্বদেশ-মন্ত্রে দীক্ষা লওয়ার কয়েক মাস পরেই জাহাঙ্গিরের পিতা খান বাহাদুর ফররোখ সাহেবের হৃদরোগে মৃত্যু হইল। জাহাঙ্গির তখন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক, সবেমাত্র সেকেন্ড ক্লাস হইতে ফার্স্ট ক্লাসে প্রমোশন পাইয়াছে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার মনে হইল, সে যেন পথ চলিতে চলিতে সহসা এক ইঁদারার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ভয় সে করিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি দিলেন আসিয়া তাহার মাতা—ফিরদৌস বেগম। আঁখির অশ্রু না শুকাইতেই তিনি সমস্ত স্টেট পরিচালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। জাহাঙ্গির পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দে একেবারে ছোট খোকাটির মতো তাহার মায়ের কোলে শুইয়া আদর-আবদারে মা-কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া পুত্রের ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, এ সবকে যে এত ভয় করিস,—আমি মরলে তখন করবি কি বলতো? এত বড় জমিদারি তুই না দেখলে আমি মেয়েমানুষ কি একা দেখতে পারব? পাঁচ ভূতে হয়তো সব চুরি করে খেয়ে নেবে।' জাহাঙ্গির সব বুঝিল। তার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে পিতাকে একটু

অহেতুক ভয় করিলেও ভালবাসিত প্রাণ দিয়া। মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল ; মা বারণ করিলেন না, শুধু গাঢ় স্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন—যেন তাহার সমস্ত অকল্যাণ দুই হস্তে মুছিয়া লইবেন !...

পিতা-মাতা জাহাঙ্গিরকে যেন অতিরিক্ত সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতেন। জাহাঙ্গির তাহাকে অতি-স্নেহ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারে নাই। সে কিন্তু এতদিন এক-আধটু বুঝিতেছিল যে, তাহাকে পিতা তাঁহার আত্মীয়দের সাথে মেলামেশা তো দূরের কথা, দেখাশুনা পর্যন্ত করিতে দিতে নারাজ। তাহাদের দেশ ও জমিদারি কুমিল্লায়—কিন্তু আজো সে কুমিল্লা দেখিল না। ছুটি হইলেই তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ওয়াল্টেয়ার, পুরী, আগ্রা, ফতেপুর, দিল্লি, লাহোর লইয়া ফিরিতেন। জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে কুমিল্লা আসিতে হইলে ফররোখ সাহেব একাই আসিতেন। স্ত্রী-পুত্র কাহাকেও সঙ্গে লইতেন না।

জাহাঙ্গির ছেলেবেলা হইতেই একটু পাগলাটে ধরনের। লোকে বলিত, 'বড়লোকের ছেলে বলেই ইচ্ছা করে ঐ রকম পাগলামি করে রে বাবা ! বাপের অত টাকা থাকলে আমরাও পাগল হয়ে যেতাম। আদূরে গোপাল, 'নাই' পেয়ে বাঁদর হয়ে উঠছে !'—অবশ্য, বলিত তাহারা গোপনেই এবং তাহারা ফররোখ সাহেবেরই কর্মচারী।

বড়লোকের ছেলের পাগলামির মধ্যে তবু একটা হয়তো শৃঙ্খলা থাকে—মানে থাকে, কিন্তু জাহাঙ্গিরের চলাফেরা বলা-কওয়ার না ছিল মাথা, না ছিল মুণ্ডু। এই হয়তো বাচালের মতো বকিয়া যাইতেছে, পরক্ষণেই ধ্যানীর মতো অতল নীরবতায় মগ্ন হইয়া গেল। এবং এই রকম নীরব সে দিনের পর দিন থাকিতে পারিত। তাহার এই মগ্নতার দিকটাই প্রমত্তকে এত আকৃষ্ট করিয়াছিল। এবং তাই সে জাহাঙ্গিরকে বিপ্লবের গোপন-মন্ত্রে দীক্ষা দিতে সাহস করিয়াছিল। ...

ইহারই কয়েক দিন পর জাহাঙ্গির ঝটিকা-উৎপাটিত মহীরুহের মতো মায়ের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া বলিল, 'বল মা, এ কি সত্যি ! এসব কি শুনি ?'

ফিরদৌস বেগম পুত্রের এই অগ্নুৎদগার-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো ধূমায়মান চোখ-মুখ দেখিয়া রীতিমত ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি কোনো-রূপে শুধু বলিতে পারিলেন, 'কি হয়েছে খোকা ? ও কি, অমন করছিস কেন ?'

জাহাঙ্গির বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, 'বাবার ভাগ্নেরা সম্পত্তির দাবি করে নালিশ করেছে—আমি—আমি—আমি নাকি জারজপুত্র, তুমি নাকি বাইজি—তাঁর বিবাহিত স্ত্রী নও—তাঁর রক্ষিতা—আমি খান বাহাদুরের রক্ষিতার পুত্র ?'—কান্নায়, ক্রোধে, উত্তেজনায় জাহাঙ্গিরের কণ্ঠ ক্ষুব্ধ দীর্ণ হইয়া উঠিল। মুখে তাহার ফেনা উঠিতেছিল লেলিহান অগ্নিশিখার মতো সে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। বিদীর্ণ কণ্ঠে সে তাহার

জননীর পায়ে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল, 'বল মা, এ মিথ্যা—মিথ্যা ! ওরা সব মিথ্যা কথা বলছে। আমি যে সূর্যালোকে আর আমার মুখ তুলতে পারছিনে ! মা ! মা !'

যাঁহাকে লইয়া এ কেলেঙ্কারি, তিনি তখন বজ্রাহতের মতো কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যেন জীবন্ত তাঁহাকে কে পোড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রাণ-দেহ সব যেন এক মুহূর্তের অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে।

জাহাঙ্গির ক্ষিপ্তেরমতো উঠিয়া তাহার মাতার হাত ধরিয়া প্রচণ্ডবেগে নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—'বল—নইলে খুন করব তোমাকে। বল—তুমি খান বাহাদুরের রক্ষিতা না আমার মা?'—বলিয়াই সে যেন চাবুক খাইয়া চমকিয়া উঠিল। ও যেন উহার স্বর নয়, ও-স্বর উহার পিতার, ও-রসনা যেন ফররোখ সাহেবের ! তাহার মাঝে তাহার পিতাকে এই সে প্রথম অনুভব করিল ! হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল। তারপর বিচারকের মতো তীব্র দৃষ্টি দিয়া মাতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অভিভূত মাতা শুধু করুণ-কাতর চক্ষে পুত্রের পানে চাহিয়াছিলেন !

জাহাঙ্গির আর একটিও কথা না বলিয়া মন্ত্র-ত্রস্ত সর্পের মতো মাথা নোয়াইয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। চলিতে চলিতে তাহার মনে হইতে লাগিল, ধরনী যেন তাহার চরণদ্বয় গ্রাস করিতেছে—যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্প হইতেছে—দানবী ধরা এখনই বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া পিষিয়া চিবাইয়া মারিবে !

যাইতে যাইতে শুনিল, মুমূর্ষু ভিখারিণী যেমন করিয়া ভিক্ষা মাগে, তেমনি করিয়া তাহার মাতা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিতেছেন, 'ফিরে আয়, ফিরে আয় খোকা, ফিরে আয় !'

জাহাঙ্গিরের প্রাণ যেন তাহারই প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিল, 'হায় হতভাগিনী ! হয়তো জাহাঙ্গির আবার ফিরবে, কিন্তু তোমার খোকা আর ফিরবে না !'

সে সোজা প্রমত্তের বাসা অভিমুখে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে সে কেবলি আপনার মনে বলিতে লাগিল, 'ওগো ধরিত্রী মা, আজ হতে আমি তোমার ক্লেদাক্ত ধুলি-মাখা সন্তান—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় ! আজ হতে আমি মানব-পরিত্যক্ত নিখিল লজ্জিত নরনারীর দলে ! ... ওগো সর্বসহা মা, যে বুকে কোটি কোটি জারজ শিশুদের নিয়ে দোলা দিয়েছ—সেই বুকে নিয়ে আমায় দোলা দাও, দোলা দাও ! যে স্পর্ধায় কুমারীর পুত্রকে করেছ মহাবীর, মহর্ষি, পয়গম্বর—সেই স্পর্ধার অক্ষয় তিলক আমায় পরাও মা !'

জাহাঙ্গির যখন উন্মত্ত মাতালের মতো প্রমত্তের বাসায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন মৃত দিবসের পাণ্ডুর মুখ সন্ধ্যার কালো কাফন দিয়া ঢাকা হইতেছে। সান্ধ্য আজান ধ্বনি তাহারি 'জানাজা'র নামাজের আহ্বানের মতো করুণ হইয়া শুনাইতেছিল। মাথার উপর দিয়া চীৎকার করিতে করিতে ক্লান্ত বায়স উড়িয়া চলিতেছিল—যেন মৃত দিবসের শবযাত্রী। ম্লান আকাশের আঙিনায় শুধু একটি তারা ছলছল করিতেছিল ক্ষীণ করুণ কিরণে—যেন সদ্য পুত্রহীনার চোখ।

প্রমত্ত জাহাঙ্গিরকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। সে নিজেদের বিপদের কল্পনা করিয়া বলিয়া উঠিল, 'কি রে, কোনো খারাপ খবর আছে না কি?' জাহাঙ্গির বলিল, 'আছে', বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে অর্গল দিয়া দিল।

বস্তির মধ্যে খোলার ঘর। যতদূর পরিষ্কার রাখা যায় স্যাঁৎসেতে নোংরা ঘরকে তার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই; তবু তাহার দীনতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে—ঘষা-মাজা বিগত যৌবনের মতো। ক্ষীণ মৃৎপ্রদীপালোকে দেখা যাইতেছে শুধু একটি ছিন্ন অজিনাসন ও ভারতের ম্লান মানচিত্র। ধূপ-গুগগুলের ধোঁয়ায় আর মাটির গন্ধে মিশিয়ে ঘরের রুদ্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে।

প্রমত্ত উদ্বেগ আর্তকণ্ঠে বলিল, 'কোথায় কি হয়েছে, বল তো!'

জাহাঙ্গির বিরস-কঠোর কণ্ঠে বলিল, 'দেশসেবার পবিত্র ব্রত আমায় দিয়ে হবে না প্রমত-দা।'

প্রমত্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক, যা ভয় করছিলাম, তার কিছু নয় তা হলে!—আবার কার সঙ্গে ঝগড়া করলি?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'বিধাতার সঙ্গে! আমি এ পবিত্র ব্রত নিতে পারি না প্রমত-দা! না জেনে নিয়েছিলাম, তার জন্যে যা শাস্তি দেবেন দিন। আমার রক্ত অপবিত্র,—আমি জারজপুত্র!' শেষ দিকে জাহাঙ্গিরের কণ্ঠ বেদনায় ঘৃণায় কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল।

প্রমত্ত চমকিয়া উঠিল। তাহার পর গভীর স্নেহে জাহাঙ্গিরকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, 'যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। ... যাক ওতে তোর লজ্জার কি আছে বল তো! যদি লজ্জিতই হতে হয় বা প্রায়শ্চিত্তই করতে হয় তা করবে বা করছে তারা, যারা এর জন্যে দায়ী। কোনো অসহায় মানুষই তো তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়!'—জাহাঙ্গির যেন পথহারা অন্ধকারে কাহার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ পাইল—তাহাই সে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরিতে চায়।

সে খাড়া হইয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'সত্যি বলছেন প্রমত-দা? আমি তা হলে নিষ্পাপ? পিতার লালসা, মাতার পাপ আমার রক্ত কলুষিত করেনি? করেছে, করেছে! আজ আমি তার পরিচয় পেয়েছি। আমার মাঝে আজ প্রথম আমি আমার পশু-পিতাকে দেখতে পেয়েছি! দেখুন প্রমত-দা, আমি জীবনে কখনো কু-কথা উচ্চারণ করিনি, কিন্তু আজ আমি এক নারীকে পিতার রক্ষিতা বলে গালি দিয়ে আমার রসনা কলঙ্কিত করেছি; —সে নারী আমারই জন্মদাত্রী! না প্রমত-দা আমার প্রতি-রক্তকণা অপবিত্র—আমার অণু-পরমাণুতে আমার পিতার কুৎসিত ক্ষুধা, মাতার দূষিত প্রবৃত্তি কিলবিল করে ফিরছে বিছের বাচ্চার মতো—যে কোনো মুহূর্তে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে আজকের মতো। আপনার মহান যজ্ঞে আমার আত্মদান দেবতা গ্রহণ করতে পারে না প্রমত-দা। পাপের যূপকাষ্ঠে আমার বলি হয়ে গেছে!' জাহাঙ্গির হাঁপাইতে লাগিল—মনে হইল, এখন বুঝি তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে।

প্রমত্ত শান্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, 'আমাদের মন্ত্র তুমি ভুলে যাচ্ছ জাহাঙ্গির। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' আমাদের ইষ্টমন্ত্র। জননী জন্মভূমির বিচার করবার অধিকার আমাদের নেই।'—শেষ দিকটা আদেশের মতো শুনাইল।

জাহাঙ্গির লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, 'মিথ্যা ও মন্ত্র! ও মন্ত্র মিথ্যা! জননী নয়, জননী নয়,—শুধু জন্মভূমিই স্বর্গাদপি গরীয়সী!'

প্রমত্ত জাহাঙ্গিরকে মায়ের মতো বুকে করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল, 'পাপ যদি তোর থাকেই জাহাঙ্গির, দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে তোকে খাঁটি করে নেব, তুই কাঁদিসনে।'

জাহাঙ্গির তখনো চিত্র-ভারত বুকে ধরিয়া উপুড় হইয়া কাঁদিতেছিল, 'শুধু তুমি, জন্মভূমি আমার, শুধু তুমি একা স্বর্গাদপি গরীয়সী,—আর কেউ নয়, আর কেউ নয়!' বুকের তলায় চিত্র-ভারত অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

পাঁচ

গ্রীষ্মের ছুটি হইয়া গিয়াছে। ছাত্রদের যৌবনোন্মুখ মন অকারণ সুখে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আজ তাহাদের সুদূর পল্লির নব-মুকুলিত আম্র-বীথির গন্ধ-স্বপন দেখিতেছে।

হারুন বাড়ি যাইবার জন্য সমস্ত গুছাইয়া তাহার খালি তক্তপোষের উপর শুইয়া কি যেন চিন্তা করিতেছিল। তাহার দেশের ট্রেন ছাড়িবার তখনো পাঁচ ছয় ঘণ্টা দেরী। পশ্চাৎ হইতে কাহার কেশকর্ষণে চমকিয়া উঠিয়া সে দেখিল জাহাঙ্গির ওর্ফে উল্‌ঝলুল্ দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছে। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, 'তোমার ট্রেন কয়টায় হারুন?'

হারুন মৃদু হাসিয়া বলিল, 'কেন, তুমিও যাবে নাকি আমার সাথে।'

জাহাঙ্গির পকেট হইতে দুইখানা টিকিট বাহির করিয়া দেখাইল, সে আগেই শিউড়ি পর্যন্ত দুইখানা টিকিট করিয়া রাখিয়াছে।

হারুন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জাহাঙ্গিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ সে কণ্ঠে করুণ আবেদন ঢালিয়া বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু তোমার তো সেখানে যাওয়া হতে পারে না ভাই।'

জাহাঙ্গির গভীরভাবে হাই তুলিয়া তুড়ি মারিয়া আলস্য-জড়িত-স্বরে বলিল, 'তুমি জান না হারুন, আমার যাওয়া হবেই, তোমার যদি না-ই হয়।'

হারুন তাহার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তুমি জান না জাহাঙ্গির, সে কী রকম অজ পাড়াগাঁ। সেখানে চামচিকের মতো মশা—'

হারুন আর কিছু বলিবার আগেই জাহাঙ্গির কৃত্রিম ভীত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'বাদুড়ের মতো মাছি, বন্য বরাহের মতো ইঁদুর হারুনের মতো বাঁদর ! এই তো, না আর কিছু ?'

হারুন হতাশ হইয়া বলিল, 'সত্যি ভাই ! তুমি কিছু মনে করো না ! সেখানে তোমার অসুবিধার একশেষ হবে ! সর্বপ্রথম তো, শিউড়ি থেকে পাঁচটি কোশ পথ 'শ্রীচরণ মাঝি ভরসা' করে পাড়ি দিতে হবে। মাঝ রাস্তায় বক্কেশ্বর নদী—'

জাহাঙ্গির নিশ্চিন্ত-আরামে সিগারেট টানিতে টানিতে বলিল, 'সে বৈতরণীতে তরণী নাই, কর্ণধার নাই, ভীষণ স্রোত, স্রোতে ভীষণ হাঙ্গর, কুম্ভীর, তিমি, সর্প, এই তো ? কিন্তু আমি জানি হারুন, এ সবের একটাও নেই সেখানে। আর যদি থাকেও তবে—'

'আল্লা আল্লা বইল্যা রে বাই নবি কইর‍্যা সার, মাজা বাইন্দ্যা চইল্যা যাইবাম বব নদীর পার !' বুঝলে ? অদৃশ্য কর্ণধারকে একেবারে অষ্টরম্ভা গোপালকাছা হয়ে উসপার !

হারুন এইবার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল। বন্ধু তাহার বাড়ি যাইবে, ইহাতে সে আনন্দিত যেমন হইতেছিল, তেমনি তাহার অসোয়াস্তিরও আর অন্ত ছিল না তাহার বাড়ির দুরবস্থার কথা ভাবিয়া। উপবাস অবশ্যই সেখানে করিতে হইবে না, কিন্তু জাহাঙ্গিরের মতো এত সুখে লালিতপালিত জমিদার-পুত্রকে যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিবার মতো সম্বলও তাহাদের নাই। এই দৈন্যের স্মৃতিই তাহার মনকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। অসহায়ের নিষ্ফল ক্রন্দনের বাষ্পে তাহার আঁখি বারেবারে করুণ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু জাহাঙ্গিরের এই অকপট বন্ধুত্বের সরলতায়, এই আত্মীয়তার দাবিতে তাহার কবি-মন ভিজিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে 'মরিয়া হইয়া' চেষ্টা করিতেছিল, জাহাঙ্গিরের কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না, কিন্তু এখন আর সে প্রতিবাদ করিল না। উল্টো, কেমন এক খুশিতে তাহার সারা মন অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। তাহার কল্পনা-প্রবণ হৃদয় সকল কিছু ত্রুটি-অভাবকে রঙিন করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সুদূর পল্লি-নীড় যেন তাহার সকল অভাব অপূর্ণতার জন্যই বেশি করিয়া সুন্দর মনে হইতে লাগিল। তাহার স্বাভাবিক বিষণ্ন মুখ খুশিতে প্রভাতের ফুলের মতো সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গির ইচ্ছা করিয়াই অতি সাদাসিধে গোটাকতক জামা-কাপড় লইয়া একটা ছোট বেতের বাক্সে ভরিল। তাহার পর দুইজন এক সঙ্গে স্নান-আহার সারিয়া স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল। হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিটের জংশনে ট্যাক্সি আসিতেই জাহাঙ্গির কি মনে করিয়া হঠাৎ গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। ট্যাক্সিওয়ালাকে সেইখানে থামিতে বলিয়া হারুনের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'এখ্‌খুনি আসছি' বলিয়াই সে কলেজ স্ট্রিট মার্কেট অভিমুখে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে যখন সে মস্ত একটা তোরঙ্গ নিজেই ঘাড়ে করিয়া আসিল, তখন হারুন যেন কোথায় কোন স্বপ্নলোকে হারাইয়া গিয়াছে। জাহাঙ্গির তোরঙ্গটা ট্যাক্সিতে

দিয়া ট্যাক্সিচালককে যখন যাইতে বলিল, তখনও হারুন তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া কী যেন ভাবিতেছে।

জাহাঙ্গির হারুনের বাহুতে এক রাম-চিমটি দিয়া গম্ভীরভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

হারুন প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'উহ! এ কি! তুমি এলে কখন?'—বলিয়া বাহুতে হাত বুলাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গির উদাস স্বরে বলিল, 'জগতে শুধু কবির স্বপ্নই নাই কবি, অ-কবির রাম-চিম্‌টিও আছে।'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'এর পরেও যদি তাতে সন্দেহ প্রকাশ করি, তাহলে হয়তো তুমি ট্যাক্সি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলবে যে, কবির স্বপ্নালোকের চেয়েও সত্যি এই মাটির পৃথিবীটা এবং ঐ মাড়োয়ারি-কণ্টকিত ফুট-পাথটা!'

হঠাৎ হারুন দেখিতে পাইল ট্যাক্সি হাওড়া স্টেশনের দিকে না যাইয়া বাগ-বাজারের দিকে ছুটিতেছে। সে একটু চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওহে জাহাঙ্গির, এ যে, বাগবাজার এসে পৌছলুম আমরা। এখানে হাওড়া স্টেশন পাওয়া যায় নাকি?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'না, এখানে পাওয়া যায় চণ্ডু আর রসগোল্লা।'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'বুঝেছি! তুমি আজকাল ঐ প্রথম চিজটা একটু বেশি করেই টানছ মনে হচ্ছে।'

ট্যাক্সি এক সন্দেশের দোকানের সামনে আসিয়া থামিতেই জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'দেখলে! ট্যাক্সিরও রসবোধ আছে!' বলিয়াই সে নামিয়া পড়িল।

হারুন হতাশ হইয়া বলিল, 'আজ স্টেশনে বসে বসে ঐ মিষ্টিই খেতে হবে। ট্রেন আর পাওয়া যাচ্ছে না। ...

গ্রীষ্মের রৌদ্র-দগ্ধ মধ্যাহ্ন।

উল্কাবেগে মাঠ-ঘাট-প্রান্তর বাহিয়া চলিয়াছে ট্রেন। সুখে আলসে হারুন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শুধু জাহাঙ্গির জানালার বাহিরে মুখ রাখিয়া রৌদ্র-প্রতপ্ত আকাশের, চোখে চোখ রাখিয়া চাহিয়া আছে। ট্রেনের প্রচণ্ড গতিবেগকে ছাড়াইয়া ইহা ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার মন ঐ তাপ-দগ্ধ আকাশের পানে। সে যেন আকাশের ঐ তপ্ত ললাটে রাখিয়া তাহার ললাটের জ্বালা অনুভব করিবে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য তখন আগুন বৃষ্টি করিতেছে। তপ্ত চুল্লির সমুখে বালিকা-বধূর মতো ধরণী এলাইয়া পড়িয়াছে।

জাহাঙ্গির দুই হাত তুলিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া মধ্যাহ্ন-দিনের সূর্যকে নমস্কার করিল। তাহার চক্ষু জলে টইটুম্বুর হইয়া উঠিল। সেই অশ্রুসিক্ত চক্ষু সূর্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া সে আপন মনে বলিতে লাগিল, জানি না বন্ধু, তোমার বুকে কিসের এ জ্বালা! কোন অভিমানে তুমি পুড়াইয়া মারিতেছ এই শান্ত ধরণীকে! আমার এ-বুকে তোমারই মতো জ্বালা বন্ধু! কিন্তু সে জ্বালায় জ্বলিয়া আমিও কেন তোমার মতো

মধ্যাহ্ন-দিনের সূর্য হইয়া উঠি না? কেন আমার জ্বালা তোমার জ্বালার সাথে আলোও দান করিতে পারে না?

ছোট্! ছোট্! ওরে যন্ত্ররাজের দুরন্ত শিশু। ছোট্ তুই আরো-আরো বেগে! নিয়ে চল্ একেবারে ঐ সূর্যের বহ্নিপিণ্ডের বুকে। চল্—চল্ ওরে ধরার ধূমকেতু। চল ঐ জ্বালা-কুণ্ডের হাম্মাম-সিনানে ঝাঁপাইয়া পড়, যেমন করিয়া কোটি কোটি উল্কাপিণ্ড ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে ঐ জ্বালা-কুণ্ডে!

ছয়

শিউড়ি যখন তাহারা পৌঁছিল, তখন রাত্রি বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। হারুন বলিল, 'এখন, কি করা যায় বল তো? এখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবে না শহরে যাবে! শহরে আমার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আছেন, যদি তোমার মতো হয় সেখানেও যেতে পারি।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'দূর সম্পর্কের আত্মীয় বাড়ির চেয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম ঢের বেশি সোয়াস্তিকর হারুন। ব্যাস! খোলো গাঁঠরি! এমন চাঁদনি রাত, প্লাটফর্মে শুয়ে দিব্যি রাত্তির কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আর যদি বল রাত্তিরেই তোমার বক্কেশ্বর পাড়ি দিতে হবে, তাতেও রাজি।'

হারুনও হাসিয়া বলিল, 'বেশ, সেই ভালো। কিন্তু প্লাটফর্মের কাঁকরগুলো সারা রাত্তির হয়তো পিঠের সঙ্গে রসিকতা করবে।'

জাহাঙ্গির তোরঙ্গটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'কাঁচকলার কবি তুমি! এমন চাঁদনি-রাতের চাঁদোয়ার তলে শুয়েও যে পিঠের তলায় কাঁকরগুলোকে ভুলতে পারে না, সে হচ্ছে—কী বলে ইয়ে—এই—পাটের দালাল!

হারুন হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'এ কী রকম উপমাটা হল?'

জাহাঙ্গির কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিল, 'ড্যাম ইওর উপমা। তোমার ঐ উপমার লেসবুনুনি দিয়ে মানুষের মোক্ষলাভ হবে না। যত সব কুড়ে আঁস্তাকুড়।'

হারুন বলিল, 'কিন্তু এই কুড়ের আস্তাকুঁড়েই পদ্ম ফুল ফোটে জাহাঙ্গির!'

জাহাঙ্গির সিগারেটের মুখাগ্নি করিতে করিতে বলিল, 'সে আঁস্তাকুড়ে নয় কবি, সে ফোটে তোমাদের ঐ মাথার গোবরে! কিন্তু এ কাব্যালোচনা এখন চুলোয় যাক, এ সিগারেটের ধোঁয়ায় তো আর পেট ভরবে না। পেটের ভিতর যে এদিকে বেড়াল আঁচড়াচ্ছে। তুমি এইসব পাহারা দাও, আমি চললাম খাদ্যান্বেষণে।'

হারুন কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে এক দাবড়ানিতে থামাইয়া দিয়া জাহাঙ্গির চলিয়া গেল! হারুন নিরুপায় হইয়া প্লাটফর্মে পরিপাটি করিয়া বিছানা পাতিয়া গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।

গ্রীষ্মের স-চন্দ্র যামিনী। তাপ-দগ্ধ আকাশের নীল দেহে কে যেন গোপী-চন্দন অনুলিপ্ত করিয়া দিয়াছে। রৌদ্র-দগ্ধ দিবস, রাত্রির শীতল কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাঁদির মতো তরুণ সারি দাঁড়াইয়া কেবলি বীজন করিতেছে।

আবেশে তন্দ্রায় হারুনের চক্ষু জড়াইয়া আসিল। এই দুঃখের, অভাবের, ধূলার পৃথিবী তাহার স্বপ্নে অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ইহার হাসি যেমন মায়াবি, ইহার অশ্রুও তেমনি যাদু জানে। এই মায়াবিনীকে তাহার একটি ক্ষীণাঙ্গী বালিকার মতো করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করিল!

হঠাৎ জাহাঙ্গিরের রাম-ঠেলায় সচকিত হইয়া হারুন উঠিয়া বসিয়া দেখিল জাহাঙ্গিরের খাদ্যান্বেষণ ব্যর্থ হয় নাই। শিউড়ির যাহা কিছু ভালো বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সে তাহার সব কিছুই চ্যাঙারি বোঝাই করিয়া আনিয়াছে।

হারুন বলিল, 'শিউড়ির খবর আমার চেয়ে তুমিই বেশি রাখ দেখছি। তুমি শহরে গিয়ে বুঝি এইসব কাণ্ড করে এলে? কিন্তু এইসব খেয়ে শেষ করতে হলে সকাল পর্যন্ত খেতেই হবে, ঘুম-টুম বাদ দিয়ে।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'আচ্ছা, আরম্ভ তো করা যাক, তারপর তোমার কপাল আর আমার হাতযশ!'

খাওয়া শেষ হইলে জাহাঙ্গির একা প্লাটফর্মে অন্যমনস্কভাবে পদচারণ করিতে লাগিল। হারুন জাহাঙ্গিরের এই অন্যমনস্কতায় বিস্মিতও হইল না, ব্যাঘাতও জন্মাইল না। অনেককেই সে বলিতে শুনিয়াছে, জাহাঙ্গিরের মাথায় ছিট আছে। সে ইহা বিশ্বাস করে নাই। জাহাঙ্গিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব তাহার যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সে আপন চোখ ও মন দিয়া যতটুকু দেখিয়াছে, তাহার অধিক জানিবার মতো অতি-কৌতূহল তাহার কোনোদিনই জাগে নাই। তাহার স্বভাবই এই। তাহা ছাড়া সে ইহাও মনে করে যে, যে স্বেচ্ছায় যতটুকু পরিচয় দেয়, তাহার অধিক জানিতে চেষ্টা করা খুব সুমার্জিত রুচির পরিচয় নয়। সে বলিত, কৌতূহল জিনিসটাই কদাকার। যাহা কেহ নিজে বলিতে চাহে না, তাহার উপর জুলুম করা বর্বরতারই কাছাকাছি। জাহাঙ্গিরকে যখন আর সকলে পাগল মনে করিত, তখন কেবল হারুনই ইহার পাগলামির, ইহার ছন্নছাড়া জীবনের মূলে কোনো সুগভীর বেদনা উৎসের সন্ধান করিত। মানুষের বেদনাকে সে অশ্রদ্ধা করিতে শিখে নাই। তাই জাহাঙ্গিরের বেদনার উৎস মূল জোর করিয়া খুঁড়িয়া বাহির করিতে চাহে নাই।

জাহাঙ্গিরের ইতিহাস সে তো জানেই না, অন্য ছাত্ররাও জানে না! জাহাঙ্গিরের পিতার মৃত্যুর পর যখন তাহার পিসতুত ভায়েরা সম্পত্তি দাবি করিয়া নালিশ করিল, তখন তাহার বুদ্ধিমতী জননী এ কেলেঙ্কারি বেশিদূর গড়াইবার পূর্বেই কি করিয়া যে ইহা চাপা দিয়া ফেলিল, তাহা দুই-চারিজন ছাড়া কেহই জানিতে পারিল না। অবশ্য,

ইহার জন্য তাহাদের বিপুল জমিদারির প্রায় এক-চতুর্থাংশ আয় কমিয়া গেল। তাহার পিসতুত ভায়েদের অবস্থা অত বড় মামলা চালাইবার মতো স্বচ্ছল ছিল না। কাজেই তাহারা এত সহজে অভাবনীয়রূপে যে সম্পত্তি পাইল, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিল, এমনকি, তাহারা আদালতে স্বীকারও করিল যে, জাহাঙ্গির সত্য সত্যই খানবাহাদুরের বিবাহিত পত্নীর পুত্র। ইহা লইয়া 'রায়-বাঘিনী' জমিদারনীর প্রতাপে জমিদারিতে কানাঘুষাও হইতে পারিল না। কাজেই এ ব্যাপার অনেককে মনে মনে ধোঁয়াইলেও আগুন হইয়া দেখা দিল না। জাহাঙ্গিরের মনও ধূমে বিষাক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু একেবারে দগ্ধিভূত হইল না। এই সান্ত্বনাটুকুই তাহার জীবনে বড় সম্বল হইয়া রহিল। এতদিন হয়তো সে সত্যই পাগল হইয়া যাইত, অথবা আত্মহত্যা করিত, শুধু স্বদেশ-উদ্ধারের মন্ত্রই তাহাকে বাঁচিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার দগ্ধজীবনকে প্রদীপ-শিখা করিয়া উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে। মরিতেই যদি হয়, জন্মের মতো অপরাধকে জীবনের জ্যোতিতে জ্যোতির্মহিমান্বিত করিয়া সে মরিবে।

জাহাঙ্গির যখন তন্ময় হইয়া পায়চারি করিতেছিল, তখন হারুন আস্তে আস্তে উঠিয়া স্টেশন হইতে শহরে বেড়াইতে গেল। এই বেদনাতুর জাহাঙ্গিরকে সে যেন সহ্য করিতে পারিত না। তাহার এই মূর্তি সে যখনই দেখিয়াছে, তখনই তাহার বুক ব্যথায় মোচড় খাইয়া উঠিয়াছে। আজো সে সহিতে না পারিয়াই সরিয়া গেল। জাহাঙ্গিরের সম্মুখ দিয়াই সে চলিয়া গেল, কিন্তু জাহাঙ্গির একটি কথাও বলিল না। এমনকি, তাহাকে দেখিয়াছে বলিয়াও মনে হইল না। কোন আবর্তে পড়িয়া সে তখন হাবুডুবু খাইতেছিল, তাহা তাহার অন্তর্যামী ছাড়া কেহ জানিল না।

অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে চলিতে হারুন যখন শহরে আসিয়া পড়িল, তখনও সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায় নাই। সম্মুখে এক মনোহারির দোকান দেখিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, টাকার অভাবে সে তাহার ভাই-বোনদের জন্য কলিকাতা হইতে তেমন কিছু আনিতে পারে নাই। জাহাঙ্গির জোর করিয়া তাহাকে টিকিট কিনিতে দেয় নাই। রাস্তায়ও তাহার কোন খরচ হয় নাই। ইহাতে তাহার যে চার-পাঁচটি টাকা বাঁচিয়াছে, তাহা দিয়া সে তাহার ভাই-বোনদের জন্য সাবান, চিরুনি, ফিতা, গন্ধতেল প্রভৃতি কিনিল। ঐ কয়টি টাকায় যাহা ক্রয় করিল, তাহা তাহার মনপুত হইল না। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মন খুশিতে ও বেদনায় ভরিয়া উঠিল, একটা কথা স্মরণ করিয়া। জাহাঙ্গিরের তোরঙ্গটা সে প্রথমে দেখে নাই কিন্তু দেখা অবধি তাহার আর জানিতে বাকি নাই যে, জাহাঙ্গির তাহার ভাই-বোনদের জন্যই কাপড়-চোপড় কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। অত খাবার যে সে একটু আগে লইয়া গিয়াছে—তাহার অর্থও সে বুঝিল। ইহাতে সে তাহাদের অভাবের সংসারে লালিত ভাইবোনগুলির জন্য যেমন খুশি হইয়া উঠিল, তেমনি—বন্ধুর নিকট হইলেও—সেই আত্মীয়তাকে কিছুতেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মন কেবলি বলিতে লাগিল, জাহাঙ্গির এই পাগলামি করিয়া

আমাদের দুর্দশার কথাটা স্মরণ না করাইয়া দিলে ভালো হইত। ব্যথায় তাহার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে যখন প্লাটফর্মে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও জাহাঙ্গির তেমনি পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। সে কিছু না বলিয়া শুইয়া পড়িল। এই উন্মাদকে দেখিয়া তাহার মনের অনেকটা জ্বালা শান্ত হইয়া আসিল। ইহার বিরুদ্ধে তাহার মন যেটুকু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার কবিমনের করুণ সহানুভূতির প্রীতিতে ধুইয়া মুছিয়া গেল।

আজ তাহার প্রথম মনে হইল, জাহাঙ্গির শুধু তাহার চেয়ে দুঃখীই নয়,—তাহার চেয়েও সে দরিদ্র, সে সর্বহারা!

সাত

ভোর না হইতেই একটা দুরন্ত কোকিলের ডাকে হারুনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সারারাত্রি সে নেশাখোরের মতো ঘুমাইয়াছে, পাশ পর্যন্ত ফিরে নাই। কত সুখের, কত বেদনার যেসব স্বপন সে সারারাত্রি ভরিয়া দেখিয়াছে, তাহার আবেশ যেন তখনো তাহার আঁখি-পাতায় জড়াইয়া আছে।

উন্মুখ যৌবনের অভূতপূর্ব সুখের পীড়ায় তাহার সারা দেহমন তখন চড়া সুরে বাঁধা বীণার মতো টন্ টন্ করিতেছিল। তাহার রক্তে রক্তে মহুয়া মদের নেশার মতো কি যেন একটা পুলক রিণিরিণি করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে তাহার কবিতার ডালি সাজায় সেই হাওয়াপরিকে আজ সে চায় না, আজ এই কোকিল-ডাকা দক্ষিণা-বাতাস-বহা গ্রীষ্ম প্রভাতে সে চায় সেই মাটির মানবীকে—যাহার মধ্যে তাহার সমস্ত কবিতা নিঃশেষ হইয়া যাইবে।...

হঠাৎ তাহার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। জাহাঙ্গির তখনো সমানে পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। সে জাহাঙ্গিরের নিকটে গিয়া দেখিল, তাহার দুই চক্ষু জবাসঙ্কাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নিশি-শেষের পাণ্ডুর গ্যাসের আলো পড়িয়া তাহার মুখ ভীষণ করুণ দেখাইতেছিল। অত্যন্ত প্রিয়জনকে স্বহস্তে হত্যা করিবার পর হত্যাকারীর মুখ চোখ যেমন হয় তেমনি।

হারুনের কবি-মন হেরেমের কিশোরীর মতো, বন-মৃগীর মতো ভীরু, স্পর্শালু। কঠিন রূঢ় কোনো-কিছুর স্পর্শ সে সহিতে পারে না ; মারামারি কলহ ইত্যাদির কোলাহল হইতে সে চিরদিন নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। তাই সে জিজ্ঞাসা করে বিধাতাকে, কেন এই কলহ, কেন এই কুৎসিত সংগ্রাম, কেন এই অশান্তি! কবে মানুষ মানুষ হইবে! খোদা, ইহাদের শাস্তি দাও! ইহারা তোমার সুন্দর সৃষ্টিকে ভয়াবহ করিয়া তুলিল! তোমার ধরণীর পুষ্পকুঞ্জ মত্ত মাতঙ্গের মতো ইহারা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।...

আজো সে জাহাঙ্গিরের এই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া শুষ্ককণ্ঠে কোনোরকমে শুধু বলিতে পারিল, 'জাহাঙ্গির!' সে আর কিছু বলিতে পারিল না। জাহাঙ্গির চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'একি! হারুন?' বলিয়াই চারিদিকে চাহিয়া লইয়া সলজ্জ অপ্রতিভ স্বরে বলিল, 'ভোর হয়ে গেছে বুঝি? খুব ভয় পেয়ে গেছ তুমি, না? ও কিছু নয়, অমন আমার প্রায়ই হয়।'

হারুন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'তুমি সারা রাত জেগে পায়চারি করেছ? আর আমি ষাঁড়ের মতন পড়ে পড়ে আরাম করে ঘুমিয়েছি?'

জাহাঙ্গির বাম করে হারুনের কণ্ঠ মালার মতো জড়াইয়া ধরিয়া শান্ত স্বরে বলিল, 'তাতে হয়েছে কি ভাই! চল আমরা বেরিয়ে পড়ি এই সময়। বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাবে। কেমন? তুমি সব গুছোও, আমি স্টেশনের যে দুটো কুলিকে ঠিক করে রেখেছি আমাদের এই বোঁচকা-পুটুলি নিয়ে যাবার জন্যে, ওদের খুঁজে বের করি ততক্ষণ।'

জাহাঙ্গির চলিয়া গেল। হারুন মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিছানাপত্র গুছাইতে গুছাইতে ভাবিতে লাগিল জাহাঙ্গিরের এই অপূর্ব আত্মসংযমের মাধুর্য। হত্যাকারীর মতো ভীষণ রুক্ষ মুখ কেমন করিয়া চক্ষের পলকে এমন সুন্দর সহজ হাসিতে ভরিয়া উঠিতে পারে, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না। সহসা তাহার মনে হয় এই বেদনার এই দুঃখের বন্ধু জাহাঙ্গির কাহাকে করিতে চায় না—যতবড় অন্তরঙ্গ বন্ধু হোক সে, তাহাকেও জাহাঙ্গির তার গোপন বেদনা-মন্দিরের সন্ধান বলিবে না। এইখানে সে একা—একেবারে একা! অমা-নিশীথিনীর অন্ধকারও সে রহস্যের সে বেদনার অন্ধকার পথে পথ না পাইয়া ফিরিয়া আসিবে!...

জাহাঙ্গির যে এমন মিলিটারি-স্টাইলে এত জোরে—এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে পারিবে, হারুন তাহা মনে করে নাই। কাজেই সারাটা রাস্তা জাহাঙ্গিরের সাথে প্রায় দৌড়াইয়া সে যখন তাহার স্বগ্রামের প্রান্তে আসিয়া পঁহুছিল, তখন আর থাকিতে না পারিয়া সে বলিল, 'দোহাই ভাই, এই গাছতলায় একটু জিরিয়ে নিতে দাও! আর পারছিনে! বাপ! তুমি এতদিন ডাক-হরকরা হওনি কেন? হাঁটা তো নয়, এ যেন হণ্টন-প্রতিযোগিতার দৌড়!' হারুন বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গির একেবারে শুইয়া পড়িয়া ঊর্ধ্বনেত্রে গাছের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কী সুন্দর ভাই তোমাদের এই দেশ! পূর্ববঙ্গের মতো একেবারে নিরবকাশ। গাছ পালার ভিড় নেই! খানিকটা মাঠ, খানিকটা তেপান্তরের মতো শূন্য ডাঙা, খানিকটা বন-জঙ্গল, দূরে দূরে গ্রাম, ক্ষীণাঙ্গ নদী—আমার কি ভালোই লাগছে, তা বলতে পারছিনে। কলকাতায় ইটের পাঁজা থেকে বেরিয়ে গায়ে যেন একটু সুন্দর পবিত্র বাতাস লাগল। এমনি একটি ছোট গাঁয়ে তোমার ঐ বক্কেশ্বর নদীর ধারে যদি আমার একটি কুটির থাকত, তা হলে সারাদিন ঐ রাখাল ছেলেগুলোর সাথে গরু চরিয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম।'

তাহার জন্মভূমির এই প্রশংসায় হারুনের বুক গর্বে খুশিতে ভরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু অকারণে জলে পুরিয়া উঠিল। সেই অশ্রু-পরিপূর্ণ দুই চক্ষুর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আর্দ্র

দৃষ্টি লইয়া হারুন তাহার পল্লি-জননীর পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার এই গাঁয়ের পথের মাটি দুই হাতের অঞ্জলি পুরিয়া মাথায় মুখে মাখিয়া পবিত্র হইয়া লয়! লজ্জায় তাহা পারিল না, পার্শ্বেই জাহাঙ্গির শুইয়া। সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 'জাহাঙ্গির! সামনের পুকুরটাতে পা হাত ধুয়ে নাওনা ভাই! তোমার যে বুক পর্যন্ত ধুলো উঠেছে দেখছি! সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু তোমার এই ধূলোর গেরুয়া রঙে রাঙা হয়ে। তুমি যেন ঘর ছাড়া বাউল!' মুগ্ধদৃষ্টি দিয়া সে জাহাঙ্গিরের উচ্ছৃঙ্খল কেশ বেশ দেখিতে লাগিল!

পুকুর পাড়ের একটা অর্জুন গাছের ডালে যে সুন্দর নীল পাখিটা বসিয়াছিল, জাহাঙ্গির তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল। এত সুন্দর পাখি সে আর কখনো দেখে নাই। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'না হারুন তোমাদের দেশে মাসখানেক থাকলে আমি একেবারে কবি বনে যাব! এত দেশ থাকতে কেন তোমাদেরই দেশে জয়দেব-চণ্ডীদাস জন্ম নেন, তা অনেকটা বুঝছি।'

সে আবার শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'না ভাই। ঐ ধুলো আর ধুচ্ছিনে পথে। বাংলার পথের ধুলো, আমার জন্মভূমির বেদনাতুর পথিকের পায়ের ধূলো—ও শুধু বুক পর্যন্ত কেন মাথা পর্যন্ত উঠলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম! পবিত্র ধুলো কি অত তাড়াতাড়ি মুছতে আছ ভাই?'

বলিয়াই দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'দেখ কবি, আমি কবিতা-টবিতা ভালো বুঝিনে? গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক আমি। কিন্তু আমার আজ এই মাঠের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে এর চেয়ে ভালো কবিতা তোমাদের কোনো কবিই লিখে যেতে পারেননি। এই মাঠের আলোর ছন্দোবদ্ধ লাইনের বন্ধনে কখনো সবুজ কখনো সোনার রঙে যে কবিতা লেখা হয়, তার কি তুলনা আছে! ঐ কৃষকের লাঙলের চেয়ে কি তোমাদের কালি-ভরা লেখনি বেশি ফুলের ফসল ফলাতে পারে? ঐ মাঠের খাতায় নিরক্ষর কবির সৃষ্টির কাছে তোমাদের জগতের সবচেয়ে বড় কবি কি তাঁর পুথির বোঝা নিয়ে দাঁড়াতে পারেন?'

হারুন দুই চক্ষে বিস্ময় ভরিয়া জাহাঙ্গিরের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কি সেই কঠোর বাস্তব-ব্রতী বস্তু-বিশ্বের পূজারী জাহাঙ্গির? কিন্তু ইহা লইয়া সে প্রশ্নও করিল না। উহাকে সে কোনো দিনই বুঝিতে পারে নাই, আজো পারিল না। সে অন্যমনস্কভাবে বলিল, 'সত্যি ভাই এরাই সত্যিকার ফুলের কবি, আমরা কথার কবি। আমরা যখন ঘরের আঁধার কোণে বসে মাকড়সার মতো কথার উর্ণাবুনি এরা তখন সারা দেশকে ফুলের ফসলের মতো সুন্দর রঙিন করে তোলে! এদের শ্রমেই তো ধরণীর এত ঐশ্বর্য-সম্ভার, এত রূপ, এত যৌবন!'

জাহাঙ্গির বলিল, 'তাই ভাবছি হারুন, এত বিপুল শক্তি এত বিরাট প্রাণ নিয়েও এরা পড়ে আছে কোথায়। এরা যেন উদাসীন আত্মভোলার দল, সকলের জন্য সুখ সৃষ্টি করে নিজে ভাসে দুঃখের অথৈ পাথারে। এরা শুধু কবি নয় হারুন, এরা মানুষ! এরা সর্বত্যাগী তপস্বী দরবেশ! এরা নমস্য।'

জাহাঙ্গির দুই হাত তুলিয়া সসম্ভ্রমে মস্তকে ঠেকাইল। হারুনের চোখ শ্রদ্ধার বেদনায় বাষ্পাতুর হইয়া উঠিল। এই সেই প্রভাতের হত্যাকারীর মতো ভয়াবহ জাহাঙ্গির!

কুলি দুইজন এইবার উঠিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিল। জাহাঙ্গির উঠিয়া কুলির মাথা হইতে হারুনের বোঁচকা ও নিজের বেতের বাক্সটা হাতে লইয়া বলিল, 'চল।' হারুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জাহাঙ্গিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জাহাঙ্গির ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'অন্যায় করেছি বন্ধু একজন মানুষের বোঝা আমারি মতো আরেকজন মানুষের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমরা এসে পড়েছি। অর্থ দিয়ে কি মানুষের হাতের সেবার, তার শ্রমের প্রতিদান দেওয়া যায়? এখন এই রাস্তাটুকু ওদের শুদ্ধ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেলেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। মানুষের একটা নূতন বেদনার দিক দেখতে পেলাম আজ। এতদিন বইয়ের পাতায় যাকে দেখেছি আজ চোখের পাতায় তার দেখা পেলাম! ...

হারুন কিছুই বুঝিতে পারিল না। জাহাঙ্গিরের তাহার সাথে আসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাস্তায় চলা পর্যন্ত যেসব ব্যাপার সে দেখিল, যাহা কিছু শুনিল, তাহাতে তাহার মধ্যে তাহার সমস্ত চিন্তা সমস্ত কিছু যেন একটা তাল পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিঃশব্দে অভিভূতের মতো পথ চলিতে লাগিল।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুই-একটি বাড়ির পরেই তাহাদের জীর্ণ খড়ো ঘর। হারুন ঘরের দুয়ারে আসিয়া পঁহুছিতেই তাহার দুইটি বোন ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইল। তাহারা তাহাদের আনন্দের আতিশয্যে হারুনের পিছনে জাহাঙ্গিরকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ তাহার দিকে চোখ পড়িতেই তাহারা জিভ কাটিয়া ছুটিয়া পলাইল।

হারুন বাহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া ভাঙা তক্তপোষে বিছানা পাতিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেই জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'দোহাই হারুন, তোমার ভদ্রতা রাখ! তুমি নিরতিশয় অতিথিপরায়ণ, মেনে নিলাম। তুমি আগে তোমার বাবা-মা ভাই-বোনের সাথে দেখাশুনো করে এস।'

হারুন হাসিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় তাহার মা আলুথালুবেশে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া বলিতে লাগিলেন, 'খোকা এসেছিস? খোকা এসেছিস? আমার জন্যে পালকি এনেছিস? মিনার জন্য সাইকেল এনেছিস? মিনা যাবে সাইকেলে, আমি যাব পালকিতে—হুই গোরস্থানে! মিনার সাইকেল! মিনা!' বলিয়াই আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হারুনের জননী উন্মাদিনী। হারুনের আর একটি ভাই ছিল, হারুনের চেয়ে দু-বছরের বড়, ডাক নাম ছিল তার—মিনা। তের বৎসর বয়সে সে মারা যায়। তাহার পরেই তাহার মাতা পাগল হইয়া যান। তাহার পিতারও কিছুদিন আগে বসন্ত হয়, তিনি কোনো রকম বাঁচিয়া যান, কিন্তু দুইটি চক্ষু চিরজন্মের মতো অন্ধ হইয়া যায়।

মৃত্যুর সময় মিনা বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কেবলি কাঁদিয়াছিল, 'আমি সাইকেল চড়ব, আমায় সাইকেল কিনে দাও!' দুর্ভাগিনী মাতা পাগল হইয়া গেলেও 'মিনা' আর 'সাইকেল' এই দুটি কথা ভুলিতে পারেন নাই!

হারুনের দুইটি বোন ও ছোট ভাইটির এই পাগলিনী মাতা ও অন্ধ পিতাকে লইয়া যে কি করিয়া দিন কাটে, তাহা ভাবিয়া জাহাঙ্গিরের শরীরের রক্ত হিম হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ হারুন একদিনও তাহার এই অসহায় অবস্থার কথা তাহার কাছে বলে নাই।

হারুন তাহার মাতাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। জাহাঙ্গির আর থাকিতে না পারিয়া আগাইয়া আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, 'মা ভিতরে চলুন।'

মাতা তাহার দিকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'মিনা এসেছিস? অ্যাঁ? তোর সাইকেল কই? আমার পালকি কই?'

হারুন ও জাহাঙ্গির ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। জাহাঙ্গির চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মাতা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'মিনা চলে গেলি? ও খোকা? মিনাকে ধর ধর! পালালো পালালো! পালালো!'

জাহাঙ্গির চলিয়া আসিতেছিল দেখিয়া হারুনের দুই বোন আসিয়া মাতাকে ধরিয়াছিল, কিন্তু মায়ের এই ক্রন্দনে জাহাঙ্গির ফিরিয়া আসিতেই তাহারা আবার উঠিয়া পলাইল। হারুন একটু রাগিয়া বলিয়া উঠিল, 'এ-সময় অত বিবি হতে হবে না তোদের! এ আমার বন্ধু জাহাঙ্গির। আমাকে দেখে যদি লজ্জা না করিস তো জাহাঙ্গিরকেও লজ্জা করবার কিছু নেই।'

এইবার তাহারা কোনো-রকমে জড়সড় হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। হারুন কি ইঙ্গিত করিতেই তাহারা দুই বোন জাহাঙ্গিরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিল। জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'কী দোওয়া করব? রাজরানী হও না অন্য কিছু?' বলিয়াই দেখিল ঘোমটার আড়াল হইতে এক জোড়া উজ্জ্বল সুন্দর চক্ষু, ভোরের তারার মতো তাহার দিকে চাহিয়া আছে। জাহাঙ্গিরের বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে চোখ ফিরাইয়া লইল! মাতা তখন অনেকটা শান্ত হইয়াছেন। জাহাঙ্গিরের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বলিতেছিলেন, 'মিনা! বাবা আমার! তুই আর যাস্‌নে। আমি সাইকেল কিনে দেবো!'

আট

পরদিন অসহ্য গরমে অতি প্রত্যুষেই জাহাঙ্গিরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়াই বাহিরবাটি হইতে হারুনকে চিৎকার করিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। হারুন ঘুম-

বিজড়িত চক্ষে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে জাহাঙ্গির? কিছু হয়েছে নাকি?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'আরে তৌবা, তোমাদের দেশটা দেখছি জ্যেষ্ঠি বুড়ির একেবারে উনোনের পাশ! কাল রাত্তির থেকে সকাল পর্যন্ত আমার অন্তত তিন কলসি ঘাম ঝরেছে! বাপ!'

হারুন হাসিয়া ভালো করিয়া কাঁছাটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, 'আমি তো সেই জন্যেই কাল ভিতরে গিয়ে শুতে চাইনি। তোমার কাছে থাকলে অন্তত খানিকক্ষণ পাখা করতে পারতাম।' বলিতে বলিতে হারুনের কাছে আবার খসিয়া পড়িল!

জাহাঙ্গির হাসিয়া উঠিল। প্রভাতের আকাশের মতো খোলা প্রাণের হাসি, সুন্দর উজ্জ্বল! 'বন্ধু তোমার 'ব্যাকটাইটা আগে ভালো করে এঁটে নাও গিয়ে।

আমি বরং ততক্ষণ একটু সাঁতার কাটি তোমাদের ঐ এঁদো পুকুরটাতে!'—বলিয়াই জাহাঙ্গির তাহার বেতের বাক্সটা খুলিয়া চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া স্টোভটা জ্বালাইয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া তোয়ালে-সাবান লইয়া পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হারুন সস্মিত আননে তাহার সাঁতার কাটা দেখিতে লাগিল।

সাঁতার কাটিতে কাটিতে জাহাঙ্গির বলিল, 'হারুন, পানিটা গরম হয়ে গেলে তোমার বোনকে নিয়ে একটু চা-টা তৈরি করে নিও ভাই। চা দুধ চিনি সব ঐ বাক্সে আছে। দোহাই!—তুমি তৈরি করতে যেয়ো না যেন! সব ভণ্ডুল করবে তাহলে! বলিয়াই জাহাঙ্গির এক ডুবে মাঝ-পুকুর হইতে ঘাটে আসিয়া চুলগুলো পিছন দিকে সরাইয়া বলিয়া উঠিল, 'হারুন, তখন বলিছল, রাত্রে আমার কাছে থাকলে খানিকক্ষণ পাখা করতে পারতে, না? তা হলে যেটুকু ঘুম আমার হয়েছিল, তাও হত না বাপ! পাশে শুয়ে একটা মন্দ মিনশে পাখা করছে দেখলে ঘুম বেচারি ঘোমটা টেনে তিন লাফে ঘর ছেড়ে পালাত। পুরুষের সেবা—উঃ সে কী ভয়ানক! ভাদ্দর বৌকে ভাসুর সেবা করতে এলে তার যেমন অবস্থা হয়, তেমনি আর কি।'

হারুন এইবার একটু জোরেই হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'দোহাই ভাই, ঐ দুঃখে তুমি জলে ডুবো না যেন! আমি কোনো দিনই তোমার সেবা করতে যাচ্ছিনে। চা-টা ভুণীকেই করতে বলছি। তবে সেও আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ নয়।'

তাহার কথার অর্থ অনুরূপ দাঁড়াইল দেখিয়া জাহাঙ্গির একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল। তবে সে তোখড় ছেলে, সহজে মুষড়াইয়া যায় না। বলিল, 'তা হোকগে, মা খাবার না রেঙে যদি বাবা ও কর্মটা করতেন তাহলে এর অনেকটা স্বাদ কমে যেত হে!' বলিয়াই জাহাঙ্গির আবার সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল।

হারুন বাড়িতে গিয়া তাহার বোন ভুণীকে হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ওরে ভুণী, জাহাঙ্গির স্টোভে চা চড়িয়ে নাইতে গেছে। তুই চা-টা একটু তৈরি করে রাখ গিয়ে। চা, দুধ, চিনি, কাপ, চামচ সব ঐখানেই আছে। ওর ঐ একটা দোষ, কোথাও যাবার সময় চায়ের সরঞ্জাম সাথে না নিয়ে যায় না!'

ভুণী হারুনের বোন দুটির মধ্যে বড়। বয়স পনর পার হইয়া গিয়াছে। দেখিতে কিন্তু আরো একটু বেশি বয়সের বলিয়াই মনে হয়। চমৎকার জ্বলজ্বলে চোখ-মুখ। সমস্ত শরীরে প্রখর বুদ্ধির দীপ্ত জ্যোতি যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সে তাহার ভ্রাতার আদেশে বাহির বাটিতে যাইতে একটু ইতস্তত করিল। ওর ঘর হইতে পুকুরটা একেবারে সামনে। তাছাড়া সে ভালো চা করিতেও জানে না। বাড়িতে ও পাঠ একেবারেই নাই।

হারুন বুঝিতে পারিয়াই একটু দুষ্টমি করিয়া বলিল, 'ওরে ভুণী, জাহাঙ্গির বলছে, তুই—এই তোরা কেউ চা তৈরি করে না দিলে ও কিছুতেই খাবে না, পুরুষ লোকেরা সেবা আর রান্না জিনিসের উপর ওর ভয়ানক আক্রোশ! আমি চা করলে ও হয়তো তা আমার মুণ্ডুতেই ঢেলে দেবে।'

ভুণী যাইতেছিল, আর তাহার যাওয়া হইল না। সে লজ্জায় রাঙা হইয়া বলিল, 'আমি যেতে পারব না, মোমিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ভুণীর ছোট বোন মোমি আজো দ্বাদশীর চাঁদ। ভুণীর মতো আজো সে ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া ওঠে নাই। সে কাছেই দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল এবং তাহার চোখে-মুখে দুষ্টুমির হাসি দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল যে, সে এই ব্যাপারের রহস্যটুকু রীতিমত উপভোগ করিতেছে।

এদেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরেও 'দিদি'কে পূর্ববঙ্গের মতো 'আপা' না বলিয়া 'বুবু' বলিয়া ডাকে।

তাহার বুবুর কথা শুনিয়া মোমি হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, 'ইস্! আমি যেতে গেছি আর কি! তোমায় ডেকেছেন, তুমি যাও।'

ভুণী কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, 'এই মোমি! যা তা বললে তোমার পিঠে চ্যালাকাঠ ভাঙব কিন্তু!'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'নে আর ঝগড়া করতে হবে না। চল, আমরা তিনজনেই যাই। আমি বসে থাকব, তোরা চা করবি।

মোমি খুশি হইয়া উঠিল। ভুণী কিন্তু একটু সলাজ-সঙ্কোচেই গেল।

বাহির বাড়িতে যাইয়া ভুণী পুকুরের দিকে চাহিতেই জাহাঙ্গিরের সাথে চোখাচোখি হইয়া গেল। জাহাঙ্গির চোখ নামাইয়া লইল। ভুণী কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও চোখ নামাইতে পারিল না। রাত্রি বেলায় বনহরিণীর চোখে শিকারীর ফ্লাশ-লাইটের জ্যোতিধারা গিয়া পড়িলে সে যেমন মুগ্ধ-বিস্ময়ে সেই আলো হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না, তেমনি করিয়া ভুণী জাহাঙ্গিরের অনাবৃত সুঠাম সুডৌল বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিয়া রহিল। ইচ্ছা করিয়াও চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। ইহা যে লজ্জার, ইহা যে অন্যায় ইহা সে ভাবিবার অবকাশ পর্যন্ত যেন পাইল না।

জাহাঙ্গিরের বিরাট বক্ষ স্নানের শ্রমে ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, শরীরের সমস্ত মাংসপেশী পরিপূর্ণভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সে এইবার ঘাটে পিছন ফিরিয়া বসিয়া—সাবান মাখিতে মাখিতে স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল, তাহার পৃষ্ঠে একজোড়া, খর-দৃষ্টির উষ্ণতা আসিয়া লাগিতেছে।

জাহাঙ্গির এইখানে একটু লাজুক। সে মহিলাদের সঙ্গে অতিমাত্রায় মিশিতে পারে, মিশিতে চায়ও। কিন্তু কোন মেয়ে একটু খর-দৃষ্টিতে চাহিলে সে আর চোখ তুলিতে পারে না। মেয়েদের সে যেমন পছন্দ করে, তেমনি ভয়ও করে। অশ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়।

সে একবার হাজারিবাগের জঙ্গলে শিকারে গিয়াছিল। একদিন রাত্রে সে ফ্লাশ-লাইট দিয়া শিকার খুঁজিতেছিল। হঠাৎ একটা হরিণের চোখে সেই লাইট পড়ায় হরিণ এমন করিয়া সুন্দর ভীতির চাহনি দিয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল যে, আর তাহাকে গুলি করিতে পারে নাই আজো ইচ্ছা করিয়াই পিছন ফিরিয়া ঘাটে বসিয়া সাবান মাখিতে লাগিল। যে হরিণী তাহার দিকে এখনই এমনি করিয়া তাকাইয়াছিল, জাহাঙ্গির জানে ইচ্ছা করিলেই তাহাকে হত্যা করিতে পারে, তবু সে বিরত হইল। তাহার কেমন যেন দয়া হয় উহাদের দেখিলে! উহাদের চোখ যাদু জানে। উহাকে এড়াইয়া চলাই ভাল-যাদুকরীকে হত্যা করায় পৌরুষ নাই।

নারী—তাহাকে সে যেমন অশ্রদ্ধা করে তেমনি ভালওবাসে—উহারা সুন্দর যাদুকরী! ... জাহাঙ্গিরের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে, দেহের মাংসপেশীসমূহ প্রস্তর-কঠিন হইয়া উঠে। একবার মনে করে, ঐ সুন্দর চোখের সুন্দর জীবগুলোকে নির্মম হস্তে সে হত্যা করিতে পারে! উহাদের চোখ সুন্দর, উহাদের মন ছলনায় কুটিল। ...

জাহাঙ্গির যখন স্নান সারিয়া উঠিয়া আসিল, তখন চা হইয়া গিয়াছে।

ভুণী ভিতরে চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, সদ্যস্নাত জাহাঙ্গির তাহার গ্রিক ভাস্করের নির্মিত মর্মর-মূর্তির মতো অনাবৃত দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আদিম মানব প্রথম অরুণোদয় দেখিয়া যেমন বিস্ময়ান্বিত চোখে জবাকুসুমসঙ্কাশ তরুণ অরুণের পানে চাহিয়া দেখিয়াছিল, এ তেমনি দৃষ্টি।

জাহাঙ্গির তাহাকে অপ্রতিভ হইবার অবসর না দিয়া বলিয়া উঠিল, 'দাঁড়াও ভাই ভুণী, পালিয়ে যেয়ো না। চা-টা যখন তৈরিই করলে, তখন না খাইয়ে আর যেয়ো না। কেমন? বলিয়াই মোমির দিকে চামিয়া বলিল, 'তোমার এখনো লজ্জা হবার মতো বয়স হয়নি, তুমি কেন অমন জড়-পুঁটুলি হয়ে বসে আছ ভাই?'

মোমি সত্যিই এতক্ষণ বিয়ের কণেটির মতো কাপড় ঢাকা দিয়া এক কোণে বসিয়াছিল, এইবার খুব খুক করিয়া হাসিতে লাগিল এবং একটু পরেই ঘোমটা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গির কাপড় বদলাইয়া চৌকাঠটার উপর বসিয়া ভুণীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, 'দাও ভাই, চা-টা দাও!'

ভুণীকে কে যেন মন্ত্র দিয়া বশ করিয়াছে।

মন্ত্রাহত সাপিনীর মতো সে না পারিল পালাইতে, না পারিল ফণা তুলিতে।

সে আস্তে আস্তে এক কাপ চা হারুনকে দিয়া দ্বিতীয় কাপটা কাঁপিতে কাঁপিতে জাহাঙ্গিরের হাতে দিল। আর একটু হইলেই পেয়ালটা পড়িয়া গিয়াছিল আর কি! জাহাঙ্গির তাড়াতাড়ি পেয়ালাটা ধরিতে গিয়া ভুণীর কয়েকটা আঙ্গুল ধরিয়া ফেলিল।

লজ্জা ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া জাহাঙ্গির চীৎকার করিয়া উঠিল, 'বাঃ বাঃ, কি চমৎকার চা-ই হয়েছে ভুণী।'

ভুণী ততক্ষণে লজ্জায় ঘামিয়া লাল হইয়া উঠিতেছিল। আর একটু থাকিলেই হয়তো সে মূর্ছিত হইয়া উড়িত। কিন্তু তাহাকে আর থাকিতে হইল না। তাহার অন্ধ পিতা উঠিয়া তাহাকে বাড়ির ভিতর হইতে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন। সে তাড়াতাড়ি পালাইয়া বাঁচিল।

হারুন এতক্ষণ কী যেন ভাবিতেছিল। তাহার আদরের বোনের এই ভাবান্তর সে লক্ষ করিয়াছিল। ইহা লইয়া সে আপন মনে কত কি আকাশ-কুসুমের সৃষ্টি করিতেছিল। কত সুখের স্বপ্ন, কত ভবিষ্যতের রাঙা উৎসবের রাঙা দিন, আরো কত কি!

জাহাঙ্গির চা খাইতে খাইতে বলিল, 'ছেলেমানুষ এরা, নাশতা তৈরি করতে দেরী হবে হারুন, এস দুটো বিস্কুট খাই।' হারুন আপত্তি করিল না। অন্যমনস্কভাবে বিস্কুট ও চা খাইতে লাগিল।

জাহাঙ্গির হঠাৎ চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, 'এই মোমি! মোমি! আমার চায়ের কাপটা শেষ হয়ে গেছে। তুমি এসে না দিলে আর এক কাপ চা কিছুতেই খাচ্ছিনে!'

মোমি বেড়ার পাশেই উঁকি মারিতেছিল। একটু বাঁকিয়া বাঁকিয়া কাছে আসিয়া চায়ের কাপটা জাহাঙ্গিরের হাতে দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেই জাহাঙ্গির খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমার সঙ্গে চা না খেলে আমি কিচ্ছু খাব না কিন্তু!'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'খা না, এও তোর দাদা-ভাই!' জাহাঙ্গিরকে বলিল, 'ওকে তুমি চেন না জাহাঙ্গির, ভয়ানক দুষ্টু। আলাপ জমে গেলে তোমায় নাকাল করে ছাড়বে। কোনদিন রাতে হয়তো তোমার কাছায় বেড়াল-বাচ্চা বেঁধে দেবে। ওর দুষ্টুমির জ্বালায় বাড়ির সকলে অস্থির।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'সত্যি! তবে রে দুষ্টু, কিছুতেই চা না খাইয়ে ছাড়ছি না তা হলে!' ...

একটু পরেই দেখা গেল, মোমি কলিকাতা সম্বন্ধে তাহার অদ্ভুত ধারণা লইয়া প্রশ্ন করিয়া জাহাঙ্গিরকে চা খাইবার অবসর পর্যন্ত দিতেছে না।

জাহাঙ্গিরও অকুতোভয়ে বলিয়া যাইতেছিল, 'কলকাতার লোকগুলোর দাড়ি হয় না, সেখানে কাপড় ময়লা হয় না, চুলের তেড়ি ভাঙে না। সেখানে মানুষ পায়ে হাঁটে না, তারা কোমর পর্যন্ত মানুষ, তারপর চারটে চাকা। তাদের চারটে চারটে চোখ। পুরুষের গোঁফ দাড়ি হয় না। মেয়েরা ছেলেদের মতো করে চুল কাটে; ছেলেরা মেয়েদের মতো চুল বড় রাখে। পুরুষে রান্না করে, মেয়েরা থিয়েটার দেখে, নাচে। ছেলেরা বাঁদর হয়ে বাবাকে ভল্লুক করে তার পিঠে চড়ে শ্বশুরবাড়ি যায়, মেয়েরা ডুগডুগি বাজায়!'

এমন সময় হারুনের ছোট ভাইটি তাহার অন্ধ পিতার হাত ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া আসিল।

জাহাঙ্গির তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, 'কাল আপনার সাথে ভালো করে আলাপ করতে পারিনি। আমরা চা খাচ্ছি, একটু দেবো? খাবেন?'

হারুনের পিতা খুশি হইয়া বলিলেন, 'দাও বাবা দেখি, ভুণী কেমন চা করলে। ভুণী চা করতে পেরেছে তো? আমরা তো কেউ খাইনে। আমিও এক কালে প্রায় তোমার মতো চা-খোর ছিলাম বাবা।' বলিয়াই গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কোন সুখময় অতীতকে তাঁহার অন্ধ চক্ষু দিয়া যেন দেখিবার চেষ্টা করিলেন!

জাহাঙ্গিরের মন করুণায় ভিজিয়া উঠিল। মুখের চা বিস্বাদ হইয়া উঠিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়াই হারুনের পিতা বলিয়া উঠিলেন, 'সত্যিই, ভুণী চমৎকার চা করেছে তো রে! ভুণী ও ভুণী!'

ভুণী সলজ্জভাবে দরজার পাশে আসিয়া অধোমুখে আঙুলে আঁচলের প্রান্ত লইয়া জড়াইতে লাগিল।

হারুন বলিল, 'ঐ ভুণী এসেছে। কি বলছিলে তাকে?'

পিতা হঠাৎ কেমন যেন বিষাদের সুরে বলিলেন, 'না, কিছু না। মোবারক কোথায় গেলি?'

মোবারক হারুনের ছোট ভাই। ছেলেটি অদ্ভুত—শান্ত ধীর প্রকৃতির। এই বয়েয়েই যেন বিশ্বের বিষণ্নতা আসিয়া তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুখে চোখে আনন্দের এতটুকু ক্ষীণ রেখাটিও নাই। বর্ণ ফ্যাকাশে সাদা, লিকলিকে, পাঁজরের হাড় কটি গোণা যায়।

মোবারক চা খাইতেছিল। পিতার ডাকে চকিত হইয়া শান্তস্বরে বলিল, 'এই যে চা খাচ্ছি!'

এরই মাঝে জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'আমরা সকলে চা খাচ্ছি, ভুণী যদি না খাও তাহলে...'

জাহাঙ্গির আর কিছু বলিবার আগেই হারুনের পিতা বলিয়া উঠিলেন, 'আর ভুণী, তোর মা তো এখনও ঘুমুচ্ছেন, তুইও খা না একটু! এমন সোনার ছেলের কাছে কি লজ্জা করতে আছে? মনে করোনা, ও তোর মীনা ভাই!'—বলিয়াই পিতা চায়ের কাপ মাটিতে রাখিয়া পাঁজর-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন!

ভুণী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের হাতে চা করিয়া খাইতে খাইতে বলিল, 'বাবা তুমি চা খাও, এই আমি খাচ্ছি।'

জাহাঙ্গির দেখিল, ভুণীর দুই আয়ত চক্ষু জলে টইটুম্বুর হইয়া উঠিয়াছে। সে আর এদৃশ্য সহিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, 'মোমি এস তো ভাই, আমরা ঐ তোরঙ্গটা খুলি। ওতে কলকাতার বড় বড় বাঁদর আছে, দেখবে?'

মোমি চীৎকার করিয়া বলিল, 'ওরে বাপরে! ও কামড়ে দেবে, আমি কিছুতেই খুলতে পারব না!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া নিজেই তোরঙ্গটা খুলিয়া একরাশ কাপড়-জামা বাহির করিয়া হারুনের পিতাকে বলিল, 'আমি এদের জন্য কিছু কাপড়-জামা এনেছি—আপনি

আদেশ না দিলে ওরা হয়তো নেবে না। ওরা তো আমারও ভাই-বোন !' একটু থামিয়া আবার বলিল, 'আমার একটিও ছোট ভাই-বোন নেই বলে আমার এত দুঃখ হয়। তাই বন্ধুদের ভাই-বোন নিয়ে সে সাধ মেটাই !—ভাই মোমি, এসব নেবে তো? না নিলে কিন্তু আজই চলে যাব আমি !'

হারুন একটু উচ্চকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, 'এসব আবার করেছ কি? এসব দামি কাপড় কিনতে তোমার তিন-চারশ টাকার কম পড়েনি যে ! এসব কখন করলে বল তো ! মিষ্টি সন্দেশ তো এনেছ বাগবাজার 'আর শিউড়ি উজাড় করে !'

জাহাঙ্গির একটু হাসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, 'এই স্টুপিড, তুই চুপ কর ! সরকার কা মাল, দরিয়া মে ঢাল ! জমিদারির এত টাকা নিয়ে কি করব? পাপের ধন পরাচিত্তিতে যাক ! আমার ভাই-বোন থাকলে খরচ করতাম না?'

হারুনের পিতা অত্যধিক খুশি হইয়া একটু ভারী কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'এর পরে আর কি বলবে বাবা ! খোদা তোমাকে সহিসালামতে রাখুন, হায়াত দারাজ করুন ! তুমি সত্যই আমার ছেলের চেয়ে বড়। যে দানে অহঙ্কার নেই, তাকে কি উপেক্ষা করতে আছে?'

ভুণী তাহার জলভরা বড় বড় দুইটি চোখ তুলিয়া জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া থাকিল। সেই দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা-করুণা-স্নেহ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল।

হারুনের পিতা হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, 'ওরে ভুণী মোমি, মোবারক ! তোরা যা, — নূতন কাপড় পরে দেখা, কেমন মানাল ! আর সালাম কর জাহাঙ্গিরকে। নতুন কাপড় পরে যে সালাম করতে হয়।'

মোমি কাপড়ের রাশ লইয়া ভুণীকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল। মোবারক উঠিল না। শান্তভাবে বসিয়া রহিল। কাপড় জামা পাইয়া সে খুশি না বিরক্ত হইয়াছে, কিছুই বোঝা গেল না।

জাহাঙ্গির একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'মোবারক, অমন করে বসে যে ! তোমার বুঝি কাপড় পছন্দ হল না? আচ্ছা দেখ তোমার জন্য কি এনেছি।'

বলিয়াই একটা ফুটবল বাহির করিয়া বলিল, 'এই নাও। আজ বিকেলে সকলে মিলে ফুটবল খেলা যাবে, কেমন?'

মোবারক তাহার আনত চক্ষু তুলিয়া বিষণ্ণমলিন দৃষ্টিতে জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আমি তো ফুটবল খেলিনে। ও সময় বাবাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।'

জাহাঙ্গিরের মন দুঃখের ম্লানিমায় মলিন হইয়া উঠিল। সে কেমন যেন হাঁ খাইয়া উঠিতে লাগিল। এত দুঃখের মাঝেও মানুষ বাঁচে কেমন করিয়া।

একটু আলাপ-সালাপ হইতেই মোমি তাহার সিল্কের জামা-কাপড় পরিয়া আসিয়া জাহাঙ্গিরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, 'তোমরা সকলে ভিতরে এস, নাশতা করবে।'

ভিতর বাটিতে যাইতে যাইতে হারুন হাসিয়া বলিল, 'গ্রিন রঙটা তোকে বড় মানিয়েছে তো রে মোমি! দেখছ, মোমির আর্ট-জ্ঞান হয়েছে।' বলিয়াই তাহার মাদ্রাজি ঢঙে কাপড় পরিবার ধরনটার দিকে ইঙ্গিত করিল।

জাহাঙ্গিরও সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, 'সত্যই ওকে তো সুন্দর মানিয়েছে! কাপড় পরাটাও সুন্দর হয়েছে।'

মোমি জাহাঙ্গিরের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, 'ও আল্লা! এ আমি বুঝি পরেছি? বুবু পরিয়ে দিয়েছে। বুবুকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে! দেখবেন চলুন।'

জাহাঙ্গির তাড়া দিয়া বলিল, 'আবার আপনি? তুমি বলবে। আর দাদা ভাই'— কেমন?'

মোমি বড় বড় দু-চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, 'ও মা! কি হবে! একদিনেই নাকি একটা মিনসেকে তুমি বলা যায়!' সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোমি লজ্জা পাইয়া ছুটিয়া পলাইল।

ভিতরে গিয়া বসিতেই শোনা গেল, হারুনের মাতা জাগিয়া উঠিয়া ভুণীর সাজসজ্জা দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, 'ওরে মা, তুই শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে আমি থাকব কি-করে? আমার মীনার মতোই যে তোর চোখ মুখ। মা তুই শ্বশুর বাড়ি যাসনে! দামাদ মিয়াকে (জামাই) বল, সে ঘর-জামাই থাকবে।'

জাহাঙ্গির হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। হারুন তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া ভুণীকে বলিল, 'ভুণী, তুই বাইরে চলে আয় না!' কিন্তু আর কিছু বলিবার আগেই ভুণীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'সত্যি ভুণী, এতে আর দোষ কি! আমিই যে চিনতে পারছিনে! মনে হচ্ছে বিয়ের কনে! কি সুন্দরই মানিয়েছে, দেখ-দেখ।' বলিয়াই আয়না লইয়া মুখের কাছে ধরিল।

ভুণী মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, 'যাও! তাহলে সব খুলে ফেলব বলছি! আমি কিছুতেই বাইরে যেতে পারব না। মা গো! কেন এসব পরলুম!'

সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল!

জাহাঙ্গির বাহির হইতে বলিল, 'কি হচ্ছে হারুন? তুমিও কম দুষ্টু নও!'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'জাহাঙ্গির! তোমার পাওনা সালামটা নিতে তুমিই ভিতরে এস ভাই। ও বলছে, এ রকম করে সেজে কিছুতেই বাইরে যাবে না। অর্থাৎ কি-না তোমার সামনে বার হবে না।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া ভিতরে যাইতেই ভুণী একবার তাহার দিকে তাকাইয়াই তাহার মায়ের বিছানায় বসিয়া পড়িয়া বালিশে মুখ লুকাইল! জাহাঙ্গির কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

হারুন ভুণীর মুখ জোর করিয়া তুলিয়া বলিল, 'ওরে, একবার দেখা ভালো করে! যে সালামের লোভে জাহাঙ্গির-বেচারা পা দুটোকে ভিতর-বাড়ি পর্যন্ত টেনে আনলে, তার থেকেই বঞ্চিত করলি বেচারাকে? ওঠ, সালাম কর।'

কিন্তু উঠাইতে গিয়া হারুন দেখিল, চোখের জলে ভুণীর মুখ ভাসিয়া গিয়াছে। সেই অশ্রুসিক্ত চোখ না মুছিয়া সে যেমন জাহাঙ্গিরকে সালাম করিতে যাইবে, অমনি এক অভাবনীয় কাণ্ড হইয়া গেল।

ভুণীর উন্মাদিনী মাতা এতক্ষণ উদাস-নির্বিকার চক্ষে সমস্ত দেখিতেছিলেন। কিছু বুঝিতেছিলেন বলিয়া বোঝা যাইতেছিল না।

ভুণী যখন জাহাঙ্গিরকে সালাম করিবার জন্য অগ্রসর হইল, তখন তিনি হঠাৎ বিছানা হইতে নামিয়া কন্যার হাত ধরিয়া জাহাঙ্গিরের হাতে দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা! উপরে আল্লা, নিচে তুমি! আমার তহমিনাকে তোমার হাতেই সঁপে দিলাম। দেখো বাবা! এ যেন কষ্ট না পায়! ওই আমার মীনা! আমার নয়নের মণি!'—বলিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন।

মাথার ওপর বজ্রপাত হইলেও বুঝি সকলে এমন স্তম্ভিত হইত না। হারুন জাহাঙ্গির, ভুণী ওর্ফে তহমিনা সকলে যেন প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে!

উঠানের আমগাছটায় বসিয়া একটা পাপিয়া ডাকিয়া উঠিল, চোখ গেল! চোখ গেল! উঁহু উঁহু চোখ গেল!

নয়

কাল-বৈশাখীর মেঘ এমনি করিয়াই দেখা দেয়। যেখানে দুঃখের বরষা, বজ্রপাতও হয় সেইখানেই। শান্ত নদীতীরে তারও চেয়ে শান্ত ভগ্ন-কুটির এমনি করিয়াই কোন এক দুর্যোগের নিশীথে ভাসিয়া যায়।

দুঃখ যে কত বড় বন্ধুর রূপ ধরিয়া আসে, হারুন তাহাই ভাবিতেছিল—একাকী দাওয়ায় বসিয়া।

অন্ধ পিতা একমনে কলিকার পর কলিকা তামাক পোড়াইতেছিলেন। অগ্নিগিরির গর্ভ হইতে যে ধূম্রপুঞ্জ নির্গত হয়, তাহার জ্বালাও বুঝি এত ভয়াবহ নয়। ঘর পোড়ে, সকলে দেখে, পোড়ারও অবধি আছে; কিন্তু মনে যদি একবার আগুন লাগে তাহা কেহ দেখেও না, তাহার অন্তও নাই।

মোমি তাহার সিল্কের শাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া আবার সেই ছিন্ন-মলিন শাড়িটি পরিয়া গৃহকর্মে রত হইয়াছে! ঐটুকু মেয়ে, তাহার এই দুঃখ ঢাকিবার কঠোর প্রয়াস দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা দায় হইয়া উঠে! এ যে কত বড় দুঃখ, কোথা দিয়া কি হইল, সে হয়তো ভালো করিয়া বুঝিতেই পারে নাই। তাহার চারিপাশে সে যেন কাহাদের দীর্ঘশ্বাস, কিসের এ বিষাদ, সে তাহা জানে না! তাহাকে সবচেয়ে বেশি বেদনা দিয়াছে--জাহাঙ্গিরের আজই কলিকাতা চলিয়া যাওয়ার আয়োজন!

উন্মাদিনী মাতা অঘোরে ঘুমাইতেছেন—উন্মাদিনী নিয়তির মতই নির্বিকার নিশ্চিন্ত আরামে!

ভুণী তাহার সকালের-পরা সাজসজ্জা লইয়া পাষাণ-প্রতিমার মতো বসিয়া আছে। হারুন একবার চুপি চুপি তাহাকে ও অলক্ষুণে বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে বলায় সে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, 'ওকে যেতে দাও ভাই, তারপর চিরকালের জন্যই খুলে ফেলব!' ইহার পর হারুন আর কিছু বলিতে সাহস করে নাই।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জাহাঙ্গির সমস্ত বাঁধিয়া ছাঁদিয়া সহজ শান্ত ভাবে হারুনদের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। হারুন তাহাকে কিছু বলিবার আগেই ভুণী ভিতর হইতে ডাকিল, 'মেজ-ভাই, শুনে যাও!'

হারুন-জাহাঙ্গির দুজনারই বুক কাঁপিয়া উঠিল।

ভুণী তাহার সেই বধূ-বেশ লইয়া অকুতোভয়ে বাহিরে আসিয়া বলিল, 'বাজান তুমি দলিজে যাও তো একটু!'

ইহা যেন অনুরোধ নয়, আদেশ।

মনে হইল, অন্ধ পিতা সব বুঝিয়াছেন। মোবারককে ডাকিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

জাহাঙ্গিরের ভয় করিতে লাগিল, বুঝি মাতার মতো কন্যারও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। সে আঙিনায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল—নিজের জন্য নয়; এই হতভাগিনীর দুঃখে! তাহার জীবন-দেবতা জীবন লইয়া কি খেলা খেলেন, তাহা দেখিবার জন্য সে নিজেকে অম্লান বদনে তাঁহার হাতেই সঁপিয়া দিয়াছে। আজিকার বজ্রপাতকেও সে তাই মাথা পাতিয়াই গ্রহণ করিবে।

ভুণী একটু জোরেই হারুনকে বলিল, 'মেজ-ভাই, আমি তোমার বন্ধুর সাথে দুটো কথা বলতে পারি?'

হারুন অবাক হইয়া ভুণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ভুণী তেমনি সতেজ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, 'বুঝেছি মেজ-ভাই, তুমি কি ভাবছ। কিন্তু ভাববার কিছুই নেই এতে। আমার মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা আমার চেয়ে কেউ বেশি বুঝবে না। আমি তোমারি তো ছোট বোন। আমায় দিয়ে অন্যায় কিছু হবে না, এ তুমি জেনে রেখো। আমি আমার দুর্ভাগ্যের শেষটুকু জেনে নিতে চাই।'

হারুনের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। ভুণী জাহাঙ্গিরের চোখের দিকে চাহিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, 'আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে, একটু ভিতরে এসে বসবেন?'

জাহাঙ্গির কলের পুতুলের মতো সে আদেশ পালন করিল।

ভুণী একেবারে জাহাঙ্গিরের পায়ের নীচে বসিয়া পড়িয়া অশ্রু-টলমল ডাগর চক্ষু দুটি উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'আপনি কি এখনি চলে যাচ্ছেন?'

জাহাঙ্গির তাহার পা চৌকিতে তুলিয়া তো লইলই না, কোন প্রকার অসোয়াস্তির ভাবও তাহার ব্যবহারে ফুটিয়া উঠিল না। সহজ শান্ত কণ্ঠেই সে বলিয়া উঠিল, 'হাঁ

ভাই আমি যাচ্ছি!' একটু থামিয়া বলিল, 'দুঃখের পসরা খোদা আমার মাথায় তুলে দিয়েছেন, তার জন্য দুঃখ করিনে, কিন্তু এর তাত যে অন্যের গায়ে গিয়ে লাগে, এ দুঃখ রাখবার আর ঠাঁই নাই। আমি এসেছিলাম দুঃখ ভুলতে, কিন্তু সে দুঃখ যে এত বিপুল হয়ে উঠবে, সে দুঃখ যে অন্যেরও ঘর পোড়াবে—এ আমি জানতাম না।'

ভুণী একটু হাসিয়া শাড়ির আঁচলটায় পাক দিতে দিতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, 'সত্যই কি তাই? আপনাদের বড়লোকের কি কোনোরকম দুঃখবোধ আছে?'

জাহাঙ্গির আহত হইয়া বলিয়া উঠিল, 'ও কথা কেন বলছ? আমরা তোমার কথায় 'বড়লোক' হলেও মানুষ। অন্তত আমার হৃদয় নেই—এমন কিছুরই হয়তো পরিচয় দিইনি এখনো।'

ভুণী তেমনি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'দেন নাই, পরে দেবেন! আচ্ছা, আপনি তো মহৎ, হৃদয়বান এবং সেইজন্যই হয়তো তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছেন! আপনি স্বেচ্ছায় এসেছেন, স্বেচ্ছায় যাবেন, এতে কারই বা বলবার কি আছে! কিন্তু আমার কি হবে, বলতে পারেন?'—আবার সে তাহার দুই আয়ত লোচনের অশ্রুর আবেদন জাহাঙ্গিরের পানে তুলিয়া ধরিল!

জাহাঙ্গির একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমি বুঝেছি ভুণী, আজ কি সর্বনাশ হয়েছে! কিন্তু তুমিও কি এতবড় মিথ্যাটাকেই সত্য বলে গ্রহণ করলে? পালিয়ে আমি যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি এই লজ্জার হাত এড়াতে। হারুন আমার কত বড় বন্ধু, তা হয়তো তুমি জান না। আমার হাত দিয়েই তোমাদের এতবড় লাঞ্ছনা ছিল, তা আমি জানতাম না। কিন্তু তুমি তো জান, এতে আমাদের কারুরই অপরাধ নেই। অপরাধ শুধু আমার দূরদৃষ্টের!'

ভুণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'দুরদৃষ্ট শুধু আপনার নয়, আমার। যে আগুন লাগায়, সে জানে না যার বুকে আগুন লাগল তার কতটুকু পুড়ল! সে যাক, আপনি যেটাকে মিথ্যা বলছিলেন, আপনি বোধ হয় জানেন না, সেটার চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে নেই! আপনি বলবেন, মা আমার উন্মাদিনী তবু তিনি আমার মা! আমরা নারী, আমরা হয়তো সকল কিছু অন্ধের মতো বিশ্বাস করি। খোদার ইঙ্গিত না থাকলে এ অভাবনীয় দুর্ঘটনা আমার উন্মাদিনী মায়ের হাত দিয়ে ঘটত না!' তাহার পর একটু থামিয়া সে শান্তকণ্ঠে বলিল, 'আমি খুলেই বলি আপনাকে, মা যার হাতে আমায় সঁপে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে নেই!'

জাহাঙ্গিরের মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীর চন্দ্রসূর্য ডুবিয়া গিয়াছে। একাকী অন্ধকারে সে অতল হইতে অতলতর গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছে।

কিন্তু সে মুহূর্তকালের জন্য। একটু পরেই সে সামলাইয়া উঠিল। সে আমার কিছু বলিতে যাইবার পূর্বেই ভুণী ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, 'আপনি যা বলবেন তা আমি জানি। ফাঁসির আসামী যেমন করে তার দণ্ডাজ্ঞা শোনে, আপনার কাছ থেকে হয়তো তেমনি করেই তেমনি কঠোর কিছুই শুনতে হবে; আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি। তবুও আমি আমার যা বলবার বললাম। আপনি আমায় পাগল বা ঐরকম

অদ্ভুত কোনো কিছু ভাবছেন, না?'—আবার সেই অস্তমান শশীকলার মতো কান্নাভরা হাসি!

জাহাঙ্গির এতক্ষণে তাহার পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া ভুণীর দিকে তাকাইয়া দেখিল, তাহার চকচকে চোখ নিমেষে ব্যথা-ম্লান হইয়া উঠিল। ঐ নিমেষের দৃষ্টি বিনিময়। তাহার মনে হইল, ঐ অপূর্ব সুন্দর দুইটি চক্ষুর জন্যই সে সর্বত্যাগী হইতে পারে!... হঠাৎ তাহার সুপ্ত আহত অভিমান যেন নিদ্রোত্থিত কেশরীর ন্যায় জাগিয়া উঠিল। বন-হরিণীর মতো চক্ষু ইহাদের, হরিণীর মতোই মায়াবি ইহারা, তবু ইহারা শিকারের জীব! ইহাদের হত্যা করায় পৌরুষও নাই, করিলে লজ্জাও নাই! তাহার মনে হইতে লাগিল, সে জাহাঙ্গির নয়—সে শুধু মদ্যপ চরিত্রহীন ফররোখ সাহেবের পুত্র!

এইবার সে একটু বক্র-হাসি হাসিয়াই বলিল, 'তোমার মা উন্মাদিনী হলেও তোমায় তা ভাবতে পারি না ভুণী। আর কোনো মেয়ে হলে তাকে ধূর্ত বলতাম—প্রগলভা না বলে; কিন্তু তোমায় তা বলতে আমার মতো কশাই-এরও বাধবে! আমার কপালই এই রকম। যারাই আমার জীবনে বিপর্যয় এনেছে, তাদের সকলেই অদ্ভুত এক-একটি জীব। কিন্তু সে কথা যাক। তুমি এখনি বলছিলে—ফাঁসির আসামির মতোই আমার দণ্ডাজ্ঞা শুনতে প্রস্তুত আছ। আমি যদি সত্যিসত্যিই তোমার যাবজ্জীবন নির্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা দিই, তুমি তা সইতে পারবে?' বলিয়াই নিষ্ঠুরের মতো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভুণী মুহূর্তের জন্য অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার পরেই সে গলবস্ত্র হইয়া জাহাঙ্গিরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, 'আপনার ঐ দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করলাম!' তাহার পর ভিতরে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, 'অনেক অদ্ভুত জীবই তো দেখেছেন জীবনে, এবং সে জীব-হত্যায় আপনার হাতযশও আছে মনে হচ্ছে, এইবার আরেকটা জীব দেখে গেলেন! কিন্তু মনে রাখবেন, যাঁদের জীব হত্যাই পেশা, তাদের সে ঋণ একদিন শোধ করতে হয় ঐ বন্য-জীবের হাতেই!'—সে রাণীর মতো সগর্বে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গির একটু চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল, 'আমার শেষ কথা শুনে যাও তহমিনা, নৈলে আমায় নিয়ে সবচেয়ে বড় দুঃখ পোহাতে হবে তোমার!' ভুণী ভিতর হইতে বলিল, 'আমি এখান থেকেই আপনার চীৎকার শুনতে পাচ্ছি, বলুন।'

জাহাঙ্গির সহসা এই ব্যঙ্গোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার অপূর্ব আত্মসংযমের বলে কণ্ঠ যথাসম্ভব শান্ত করিয়া বলিল, 'আমি প্রেমও বিশ্বাস করিনে, পৃথিবীর কোনো নারীকেও বিশ্বাস করিনে! মনে হচ্ছে, তোমার সব কথাই আর-কারুর শেখানো অথবা ওগুলো অতিরিক্ত নভেল পড়ার বদহজম! তোমাদের জাতটারই নির্বাসন হওয়া উচিত। একেবারে কালাপানি!'

ভুণী রেকাবিতে করিয়া এক রেকাবি সন্দেশ ও এক গ্লাস পানি লইয়া জাহাঙ্গিরের সামনে রাখিতে রাখিতে সহজ কণ্ঠেই বলিল, 'আপনি বড্ডো দুর্মুখ! যাবেনই তো, যাবার সময় একটু মিষ্টিমুখ করে যান।' বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'মাফ করবেন,

আপনার দেওয়া মিষ্টি দিয়েই আপনার তেঁতো মুখ মিষ্টি করতে হচ্ছে। জানেনই তো, আমরা কত গরীব! তাতে আবার পাড়াগেঁয়ে! একটা ঘরের মিষ্টি দিয়ে আপনার জমিদারি মুখের ঝাল মিটাতে পারলাম না! আপনি খান, আমি দুটো পান সেজে আনি।' বলিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গির আর একটি কথাও না বলিয়া সুবোধ বালকের মতো রেকাবির মিষ্টি গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। তাহার আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল, মিষ্টি যে এত মিষ্টি হয়—তাহার সে জীবনে উপলব্ধি করে নাই, হয়তো আর কখনো করিবেও না। কিন্তু এই নারী, প্রগলভা তরুণী! এ কোথা হইতে আসিল? বনফুলের এত সৌন্দর্য, এত সুবাস! গহন বনের অন্ধকারে এ কোন কস্তুরী-মৃগ তাহার মেশক-খোসবুতে সারা বন আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। কয়লার খনিতে এ কোন কোহিনূর লুকাইয়া ছিল? জাহাঙ্গির যেন দিশা হারাইল। সে জাহাঙ্গির নয়, বিলাসী ফর্‌রোখ সাহেবের পুত্র নয়, সে 'শিভালরি' যুগের বীর-নায়ক, বিংশ শতাব্দীর সভ্য যুবক! সে এই মহীয়সী নারীর অবমাননা করিবে না! আপনার অজ্ঞাতেই তাহার কণ্ঠ দিয়া উচ্চারিত হইল, 'তহমিনা! তহমিনা!'

ভুণী তসতরিতে পান লইয়া আসিতেছিল। জাহাঙ্গিরের এই অস্বাভাবিক স্বরে একটু বিস্ময়ান্বিত হইয়াই সে নিকটে আসিয়া বলিল, 'আমায় ডাকছিলেন?'

জাহাঙ্গির অপ্রতিভ হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, 'না?' জাহাঙ্গির নিজেই চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার নিজের কণ্ঠস্বরে যে এত মধু আছে তাহা সে নিজেও জানিত না।

ভুণী স্নেহ-গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'এই তো বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো সব মিষ্টিই খেয়েছেন দেখছি। দেখুন, আপনি বড্ডো বদরাগি, হয়তো আপনার কোনো অসুখ-বিসুখ আছে। দোহাই কলকাতা গিয়ে একটু চিকিৎসা করাবেন!' বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তাইতো বলি, যে লোক দুহাতে এত হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি বিলাতে পারে, তার মেজাজ কি এত তেঁতো হয়! আর দুটো মিষ্টি এনে নেই, লক্ষ্মীটি, 'না' বলবেন না। সেই কখন দুপুর রাত্তিরে কলকাতা পৌঁছাবেন, আর খিদের চোটে রাস্তায় হয়তো কাউকে খুন করেই বসবেন! যা মেজাজ, বাপরে!' বলিয়াই জাহাঙ্গিরের দিকে গভীর সানুরাগ দৃষ্টি দিয়া তাকাইতেই দেখিল জাহাঙ্গির মুখে ক্রমাগত পান ঠাসিতেছে।

ভুণী এইবার ছেলেমানুষের মতো তরল কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, 'অ মা! কি হবে! পান খেয়ে ফেলেছেন? ফেলে দিন, ফেলে দিন! বেশ! ফেলবেন না তো!' বলিয়াই বহুদিনের রোগক্লান্ত রুগীর মতো শান্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'চির-নির্বাসনই তো দিয়ে গেলেন। আপনাকে যতটুকু জেনেছি, তাতে এ আমার ধারণা যে, আর আমাদের কোনকালেই দেখা হবে না।' তাহার পরে একটু থামিয়া চোখ-মুখ ডাঁশা আপেলের মতো লাল করিয়া সলজ্জকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আমাদের যদি আজ সত্যসত্যিই বিয়ে হয়ে যেত, তাহলে এক বছরেও হয়তো এত কথা এমন করে বলতে পারতাম না আপনার

কাছে। দুর্দিন মানুষকে এমনি বেহায়া করে তোলে! আমার যে এক মুহূর্তেই জীবনের সাধ মিটিয়ে ফেলতে হবে! আমার মতো দুর্ভাগিনী এক কারবালার সকিনা ছাড়া বুঝি কেউ নেই!' বলিয়াই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

জাহাঙ্গিরের কেবলি মনে হইতে লাগিল সে বুঝি ইহজগতে নাই। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার সমস্ত অঙ্গ যেন কাহার অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া যাইতেছে! সে না পারিল নড়িতে, না পারিল একটা বাক্য উচ্চারণ করিতে! কিন্তু তাহার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন সে দেখিল অল্প পরেই ভুণী আর এক রেকাবি সন্দেশ লইয়া তাহার সম্মুখে রাখিতেছে। তাহার মনে হইল, কে যেন যাদু করিয়া তাহাকে এই রহস্য-পুরীতে বন্দি করিতেছে। সে যেন সকল দেশের সকল গল্প-কাহিনীর নায়ক—রূপ-কুমার। হঠাৎ সে অভিভূতের মতো বলিয়া ফেলিল, 'তহমিনা! তুমি আমার সাথে যাবে? জানি না, তুমি কারবালার সকিনা, না সিস্তানের তহমিনা। বল, তুমি যাবে?'

ভুণী দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, 'না!'

জাহাঙ্গিরের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। সে আবার বহুক্ষণ ধরিয়া ভুণীকে দেখিল! দেখিয়া দেখিয়া যখন সাধ মিটিতে চায় না; হায় রে ভূখারী অবিশ্বাসী চোখ! তবু সে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন যাবে না? তুমিই না বলছিলে, তোমার মা যার হাতে তোমায় সঁপে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড় সত্য তোমার আর নেই।'

ভুণী মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'এখনো তাই বলছি। তবু এমন করে তো যাওয়া যায় না। আপনাকে আমি উপদেশ দিতে পারি এত বড় স্পর্ধা আমার নেই। আমার অন্তরের সত্য যত গভীরই হউক, তবু তাকে সমাজের কাছে রং বদলিয়ে নিতে হবে। নৈলে কেউই সুখী হতে পারব না।

জাহাঙ্গির অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তাহার পর কম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'তা হতে পারে না ভুণী, আমি এতক্ষণ ভুল বকছিলাম। আমায় ক্ষমা কর। যে প্রেমে অবিশ্বাস করে, তার মতো হতভাগ্য বুঝি বিশ্বে কেউ নেই। তার কোথাও কোনো-কিছুতেই সুখ নেই। আমায় নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না, আমিও তোমায় নিয়ে—শুধু তোমায় বলে নয়—কোনো নারীকে নিয়েই সুখী হতে পারব না। যে সত্যকে আমি চোখের সামনে দেখি, তাকেও বিশ্বাস করতে পারিনে, আমার রক্তে রক্তে যেন প্রতিধ্বনি ওঠে, 'ভুল ভুল, এ সব মিথ্যা, ছলনা। আমি তোমায় আমারো অজানিতে দুঃখ দিয়ে গেলাম। কিন্তু তুমি তো জান—আমার অপরাধ কতটুকু। তোমার কোনদিন কোনো উপকার করেও যদি আমার এ অনিচ্ছকৃত অপরাধের লাঘব করতে পারি, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব—শুধু এইটুকুই মনে রেখো আমার। আর সব ভুলে যেয়ো!' শেষের কথা কয়টি বলিবার সময় তাহার কণ্ঠ যেন ভাঙিয়া আসিতেছিল!—সে তাড়তাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, 'তবে যাই এখন!'

ভুণী ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'অনুগ্রহ করে আপনার এই কাপড় ক'খানা নিয়ে যান! একটু, বসুন, আমি আসছি।'

জাহাঙ্গির চলিয়া যাইতেছিল! ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আমি তো তোমায় নির্বাসনই দিলাম, ঐ শাড়ি তোমার জেলের পোশাক!'

তহমিনা সেইখানেই ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর মতো লুটাইয়া পড়িয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আমি পারব না পারব না এ শাস্তি বইতে! নিষ্ঠুর, আমায় তুমি প্রাণদণ্ড দিয়ে যাও, এ নির্বাসন দিয়ো না, দিয়ো না!'

দুটো পাপিয়ায় তখনো আঙিনায় যেন আড়াতাড়ি করিয়া ডাকিতেছিল, 'পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা! চোখ গেল, চোখ গেল!'

দশ

সন্ধ্যার পূর্বেই জাহাঙ্গির গরুর গাড়িতে চড়িয়া শিউড়ি চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার বিষণ্ণতা এমন করিয়া বুঝি আর কখনো নামে নাই হারুনদের বাড়িতে।

ভুণীর যখন জ্ঞান হইল, তখন তাহার সর্বপ্রথম এই প্রার্থনাই অন্তর ভরিয়া গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল, ধরণী দ্বিধা হও! এ মুখ যেন আর দেখাইতে না হয়!

সেও কি সত্যসত্যই তাহার মাতার ন্যায় উন্মাদিনী হইল? নহিলে এত কথা এমন লজ্জাহীনার মতো সে বলিল কেমন করিয়া? সন্ধ্যার এ অন্ধকার যেন আর না কাটে! সে আর আলোকের মুখ দেখিতে পারিবে না।

কেহ সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিলও না—কেহ জ্বালিতেও বলিল না। আলো জ্বলিয়া উঠিলে বুঝি এ বেদনা এ লজ্জার কালিমা দ্বিগুণতর হইয়া দেখা দিবে।

বাড়ির প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের কাছে অপরাধী!

উন্মাদিনী মাতার আবোলতাবোল বকুনির মাঝে ক্রন্দনও শোনা যাইতেছিল, 'মীনা আমার! বাপ আমার! এসে আবার চলে গেলি?'

হারুন এতক্ষণ একটি পুকুরের নির্জন পাড়ে বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিল। জাহাঙ্গিরের তো কোনো অপরাধই নাই। কিন্তু নাই বা বলি কেমন করিয়া? সে কেন এ দরিদ্রের বাড়ি আসিতে চাহিল? যদি আসিলই এবং দৈবক্রমে এ দুর্ঘটনা ঘটিলই যদি, সে কেন ইহার মীমাংসা করিয়া গেল না? হতে পারে, তাহারা দরিদ্র, কিন্তু বংশ-গৌরবে তাহারা তো একটু খাটো নয়। আর ঐ ভুণী, অমন অপরূপ সুন্দরী, অপূর্ব বুদ্ধিমতি মেয়েও কি তাহার বধূ হইবার অযোগ্যা? তাহাকে যে অবহেলা করিয়া গেল, এই বেহেশতি ফুলের মালাকে যে পদদলিত করিয়া গেল, সে কি মানুষ? ভালোই হইয়াছে, ঐ হৃদয়হীন বাঁদরের গলায় এ মুক্তার মালা শোভা পাইত না বলিয়াই এ অঘটন ঘটিয়া গেল! ... কিন্তু ভুণী! উহার কি হইবে? জাহাঙ্গিরের সাথে তাহার সমস্ত কথাই সে শুনিয়াছে। ভুণীদের সে ভালো করিয়াই চিনে। সে ভাঙ্গিবে

কিন্তু নোয়াইবে না? সে ভয় করিতে লাগিল, এইবার তাহার অন্ধ পিতা আর বাঁচিবে না?

হঠাৎ তাহার মনে হইল জাহাঙ্গিরের বিদায়-ক্ষণের কথা। সে হারুনকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়াছিল, 'আমার সব কথা শুনলে তুমিই আমায় তোমার বোন দিতে রাজি হবে না হারুন!' হারুন পীড়াপীড়ি করাতে সে বলিয়াছিল, 'সব কথা আমার বলতে চাইনে ভাই। হয়তো বা আমার সব কথা আমি নিজেই জানিনে। কিন্তু আমার যেটুকু কৃতকার্যের জন্য আমি দায়ী, অন্তত সেইটুকু শুনলেই তোমার রক্ত হিম হয়ে যাবে? আমি খুলেই বলি, আমি বিপ্লবী?'

চলিতে চলিতে হঠাৎ গোখরো সাপের গায়ে পা পড়িলে মানুষ যেমন চমকাইয়া ওঠে হারুন তেমনি চমকিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, 'জাহাঙ্গির তুমি—তুমি—বিপ্লবী?'

অবশ্য বিপ্লবী—রিভোলিউশনারি যে কোনো ভয়ানক জীবকে বোঝায় তাহা সে স্পষ্ট করিয়া জানিত না। আর স্পষ্ট করিয়া জানিত না বলিয়াই, তাহার অত ভয়? ভূত দেখা যায় না বলিয়াই না লোকের এত ভূতের ভয়! হারুন ছেলেবেলা হইতেই একটুকু অতিরিক্ত ভীরু। আজো সে রাতে একা ওঠা তো দূরের কথা—একা ঘরে শুইতেও ভয় করে। কাজেই চোখের সামনে একজন বিপ্লবীকে দেখিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল সে সত্য সত্যই ভূত দেখিতেছে? সে জানিত বিপ্লবীদেরে, তাহারা তো দূরের কথা, সি-আই-ডি পুলিশেও দেখিতে পায় না? উহারা আকাশলোকে অভিশাপের মতোই ধরা-ছোঁয়ার বহু ঊর্ধ্বে থাকিয়া বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং হঠাৎ বজ্রপাতের মতোই কখনো শিরে আসিয়া পতিত হয়।

কোনো রকমে সে বলিল, 'কিন্তু বিপ্লবীরা যে ভীষণ লোক জাহাঙ্গির! তুমি তো তা নও!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল, 'ভয় নেই হারুন, বিপ্লবীরা তোমার আমার মতো ঘরের মানুষ, বনের বাঘ নয়! আর যদি আমাদের সত্যিই তা মনে কর, তা হলে তো তোমারই এ বিয়েতে সর্বপ্রথম অসম্মত হওয়া উচিত! কিন্তু আসল কথা কি জান হারুন, আমি বিয়ে করতে পারি না, আমাদের বিয়ে করতে নেই!'

হারুন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো জাহাঙ্গিরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল!

জাহাঙ্গির হঠাৎ একটু কর্কশ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, 'তুমি 'এত বেশি ভীরু তা আমি জানতাম না হারুন। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তোমায় আমার এ পরিচয় দিয়ে ভালো করিনি। আমরা সত্যিসত্যিই বাঘের চেয়েও ভীষণ—কিন্তু শুধু তারি জন্য, যে বিশ্বাসঘাতকতা করে! আমি যে কথা তোমায় বললাম তা ঘুণাক্ষরেও যদি প্রকাশ পায়, তাহলে বন্ধু—বলিয়াই সে বুকের তলা হইতে যে অস্ত্র বাহির করিয়া দেখাইল তাহাতে হারুন পতনোন্মুখ বংশপত্রের মতো কাঁপিতে লাগিল!

জাহাঙ্গির পরক্ষণেই হাসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'আশা করি—কোনো দিনই এর প্রয়োজন হবে না বন্ধু। অনেক দুঃখ দিয়ে গেলাম, তবে এর এককণা ঋণও যদি পরিশোধ করতে পারি কোনো দিন তাহলে আমার মনের অনুশোচনা অনেক

কমে যাবে! ... আর দেখ, তুমি একটু চেষ্টা করলেই ভুণী সব ভুলে যাবে! হাজার হোক সে ছেলেমানুষ বৈ তো নয়! তা ছাড়া মা উন্মাদিনী হলে ছেলেমেয়ে একটু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হয়। তবে এ মাটির পৃথিবীতে ওসব টেকে না ভাই, এই যা ভাবনার কথা।'

শেষের দিককার কথা কয়টার নিষ্ঠুরতা ও বিরসতা হারুনকে গভীরভাবে বাজিলেও সে শুষ্ককণ্ঠে কোনোরকমে বলিয়াছিল, 'তা হলে এস ভাই! আশা করি এর পরও আমরা বন্ধু থাকব!' জাহাঙ্গির 'নিশ্চয়' বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

হারুন কেবলি ভাবিতে লাগিল, একটা লোকই একসঙ্গে এত ভালো এত মন্দ কি করে হতে পারে!

এমন সময় অন্ধ পিতার ডাক শুনিয়া হারুনের দুঃস্বপ্ন টুটিয়া গেল। ভিতরে ঢুকিয়া সে একটু উচ্চকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, 'আজ কি বাতি জ্বলবে না বাড়িতে?'

ভুণী উঠিয়া আলো জ্বালিতে চলিয়া গেল।

হারুন দাওয়ায় উপবিষ্ট তাহার পিতার নিকট বসিয়া পড়িল, 'আমায় ডাকছেন আব্বা!'

অন্ধ পিতা ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন, 'হু!', তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, 'এখন কি করা যায়—ঠিক করলে কিছু?'

হারুন নম্রস্বরে বলিল, 'এর কি আর ঠিক করবার আছে?'

তাহার পিতা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কিছু করবার নাই? বেশ! তোমার কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। আমি পিতা হয়ে চোখের সামনে মেয়ের সর্বনাশ দেখতে পারব না। আমি কালই জাহাঙ্গিরের মাকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দিব। দেখি উনি কি বলেন, তারপর আমরা যা করবার করব।'

হারুন মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিল, 'না আব্বা, তা তুমি করতে পারবে না। ওতে আমাদের মান-ইজ্জতের হানি ছাড়া লাভ কিছু হবে না।'

অন্ধ পিতা বহুক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ বাবা, কিন্তু এছাড়া তো উপায়ও দেখছি না। তুই তো জানিস হারুন, ভুণী কেমন ধাতের মেয়ে। ওকে কি কেউ বিয়ে দিতে পারবে মনে করিস? তোর কাছে যা শুনেছি, তাতে মনে হয়, জাহাঙ্গিরের মার সত্যিকারের বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, হৃদয়ও আছে। আমার এই দুঃখের কাহিনী শুনলে তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে এর একটা সমাধান করবেনই।'

হারুন বলিল, 'তুমি জাহাঙ্গিরকে চেনো না আব্বা, ওর মা কেন, ওর বিধাতা এসেও ওকে টলাতে পারবেন না। তুমি ও-চেষ্টা করো না।'

পিতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তুই থাম হারুন, তুই আমার চেয়ে বেশি বুঝিস না। ভুণীর কপাল যদি পুড়েই থাকে, তা হলে ভালো করেই পুড়ুক! আমিও আমার দুঃখের শেষ সীমা দেখে নিই। তারপর উপরে খোদা আছেন, আর পায়ের নিচে তো গোর আছেই।'

এগারো

জাহাঙ্গিরের জীবনে এই প্রথম গরুর গাড়ির অভিজ্ঞতা।

জাহাঙ্গির যখন বলিল, সে কিছুতেই তাহার বোঝা আর একজন মানুষের অর্থাৎ কুলির মাথায় চড়াইয়া দিয়া তাহার অবমাননা করিবে না, বরং সে তাহার আভিজাত্যের অভিশাপ নিজেরই মাথায় তুলিয়া বহিয়া লইয়া যাইবে, তখন হারুন একরকম জোর করিয়াই তাহার জন্য গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া দিল।

গরুর গাড়িতে চড়িতে জাহাঙ্গিরের শহুরে সংস্কারে একটু বাঁধিলেও সে আর আপত্তি করিল না। একটু কৌতূহলও যে হইল না, এমন নয়।

হারুন হাসিয়া বলিয়াছিল, 'আশা করি গো জাতির প্রতি তোমার মানবত্ববোধ আজো প্রবল হয়ে ওঠেনি!'

জাহাঙ্গিরও হাসিয়া বলিয়াছিল, 'না বন্ধু! বাঙালির বুদ্ধি আজো সে রকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। ওরা হনুমান ও গরুর পূজা করেনি কখনো! ঐ দুটো জীব বাংলার বাইরেরই দেবতা হয়ে আছেন!...'

গরুর গাড়িতে চড়িয়া ক্রোশ-খানেক যাইবার পর জাহাঙ্গিরের কৌতূহলও উৎসাহ একেবারে জল হইয়া গেল! অসমান গ্রাম্যপথে ঘণ্টায় প্রায় এক মাইল গতিতে সনাতন গো-যান যে বিচিত্র শব্দ করিয়া ধূলি-পটল উড়াইয়া চলিতেছিল, তাহাতে জাহাঙ্গিরের ধৈর্য ধরিয়া বসিয়া থাকা এক প্রকার অসহ্য হইয়া উঠিল! অনবরত ঝাঁকুনি খাইতে খাইতে তাহার মনে পড়িল বহু পূর্বে তাহার একবার ডেঙ্গু জ্বর হইয়াছিল, তাহাতে যে গা-হাত-পায়ের ব্যথা হইয়াছিল, সে বোধ হয় ইহার কাছে কিছু নয়। সে আর থাকিতে না পারিয়া নামিয়া পড়াতে বেচারা গাড়োয়ান বিনম্র-স্বরে বলিয়া উঠিল, 'জি, নামলেন কেনে?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'তোমার 'জি', সাধ করে নামলেন না বাপু, তোমার গাড়ি তাকে নামিয়ে তবে ছাড়লে!'

গাড়োয়ান গাড়ি থামাইয়া বলিল, 'জি' গাড়িতে উঠে বসুন, আমি একটু চাঁওড় করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এই শালার গরু হুজুর একটু বেয়াড়া, তাই তো ভয় করে—কোথায় গোবোদে ফেলিয়া দিবে। নইলে দাঁদাড়ে নিয়ে যেতুম!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তুমি 'দাঁদাড়ে' নিয়ে চল বাপু, আমি খানিকটা হেঁটে যাই।' বলিয়াই গাড়ির পিছনে পিছনে আস্তে আস্তে হাঁটিয়া চলিল।

ধূলি-ধূসরিত জন-বিরল গ্রাম্য পথ। দুই পাশে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। যেমন উদাসিনী বিরহিণী। দূরে ছায়া-নিবিড় পল্লি-ঝিল্লির ঘুম পাড়ানিয়া গানে যেন মায়ের কোলে শিশুর মতো ঘুমাইতেছে। জাহাঙ্গিরের মন কেমন যেন উদাস হইয়া গেল।

পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, সে যেন উদাস বাউল, না-জানার সন্ধানে এই পথে পথে গান গাহিয়া ফিরিতে আসিয়াছে। যাহারা তাহার পথে আসিতেছে

পরিচিতির রূপে, তাহার কেহ নয়। যে উদাসিনীর অভিসারে সে চলিয়াছে, সে এই পল্লি-বাটের না-জানা উদাসিনী। তাহাকে অনুভব করা যায়, রূপের সীমায় সে অসীমা ধরা দেয় না...

এমন সময় গাড়ির গো-বেচারি গো-যুগলকে গাড়োয়ান এমন ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, যাহাতে জাহাঙ্গিরের স্বপ্ন এক নিমিষে টুটিয়া গেল। হাসিতে হাসিতে সে পথের ধারেই ধূলার উপর বসিয়া পড়িল। একটু পরে পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, কেন এ দেশে এত বাউল এত চারণ এত কবির সৃষ্টি হইল। এত উদাস, তপস্বীর ধ্যানলোকের মতো শান্ত নির্জন ঘাট-মাঠ যেন মানুষকে কেবলি তাহার আপন অতলতার মাঝে ডুব দিতে ইঙ্গিত করে। এ তেপান্তরে পথের মায়া যেন কেবলি ঘর বুলায়, একটানা পূরবী সুরের মতো করুণ বিচ্ছেদ-ব্যথায় মনকে ভরিয়া তোলে, গৃহীর উত্তরীয় বাউলের গৈরিকে রাঙ্গিয়া উঠে!

এতক্ষণ যতবার তাহার ভূণীকে মনে পড়িয়াছে, ততবারই তাহার মন অবিশ্বাসের কালিতে কালো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই জন-বিরল উদাস প্রান্তরে আসন্ন সন্ধ্যায় চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, এমনি একটি শান্ত পল্লিপ্রান্তে ছায়া-সুশীতল কুটির রচনা করিয়া তাহাকে লইয়া সে স্বর্গ রচনা করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না! তাহার পিতার পাপ তাহার রক্তকে কলুষিত করিয়াছে। যে-কোনো মুহূর্তে সে তাহার পিতার মতোই ব্যভিচারী হইয়া উঠিতে পারে! সে জানে, তাহার রক্তের চঞ্চলতাকে, তাহার ভীষণ উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে তাহার কত বেগ পাইতে হইয়াছে। তাহার স্বর, তাহার অবয়ব, তাহার রক্ত সমস্তই ফররোখ সাহেবের। উহার মধ্যে যেটুকু জাহাঙ্গির, তাহা এই পশুর কাছে টিকিতে পারে না। পাপই যদি করিতে হয়, পশুর কবলেই যদি আত্মাহুতি দিতে হয়, তবে সে একাই দিবে, এ পাপের সাথী অন্যকে করিবে না!

তাহার পিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মাথায় যেন খুন চাপিয়া গেল। বুকের কাছে লুকানো রিভলভারটা একটানে বাহির করিয়া ফেলিল। আবার কি মনে করিয়া সেটাকে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া গরুর গাড়িকে পিছনে ফেলিয়া দৃপ্তপদে পথ চলিতে লাগিল।

যাইবার সময় গাড়োয়ানের দিকে রোষ-কাষায়ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া গেল, 'রাস্কেল, তুমি যদি তাড়তাড়ি গাড়ি না চালাও, তাহলে এই বনের মধ্যে তোমায় মেরে পুঁতে ফেলব!'

গাড়োয়ান বেচারা ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রাণপণে জাহাঙ্গিরের সাথে গাড়ি চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল! জাহাঙ্গিরের রক্তবর্ণ চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে ইচ্ছা করিলে সত্য-সত্যই তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে!

শিউড়ি যখন তাহারা আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। গাড়োয়ান কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিল, 'হুজুর, বলদ দুটো আর বাঁচবে না, মর-মর হয়ে গিয়েছে হুজুর! সারা রাস্তা আমি মেরে দৌড়িয়ে এসেছি হুজুর!'

জাহাঙ্গির একটিও কথা না বলিয়াই একটা পাঁচ টাকার নোট গাড়োয়ানের হাতে দিয়া গাড়ি হইতে সমস্ত জিনিস নিজে বহিয়া প্লাটফর্মে আনিল। গাড়োয়ান এই আশ্চর্য লোকটির কোন কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। সে আর গোলমাল না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জাহাঙ্গির তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'এই, শোন!' বলিয়াই সে ল্যাম্প-পোস্টের কাছে দাঁড়াইয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, 'দেখ, এই চিঠি যদি ভুণীকে লুকিয়ে দিতে পারিস—তোকে দশ টাকা বখশিশ দেব। পারবি?'

গাড়োয়ান হতভম্ব লইয়া জাহাঙ্গিরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

জাহাঙ্গির তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, 'হাঁদারাম! হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কি? ভুণীকে চিনিস? হারুনের বোন?'

গাড়োয়ান কম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'হুজুর উয়াকে চিনব না? এইতো সেদিন আমাদের কাছে ডেং ডিঙিয়ে বড় হয়ে উঠল!'

জাহাঙ্গির তাহার কাছে গিয়া কণ্ঠস্বর কমাইয়া বলিল, 'তাকেই পৌঁছে দিতে হবে এই চিঠিটা, বুঝলি? তোর মেয়ে-টেয়ে কেউ নেই বাড়িতে? তার হাত দিয়ে—বুঝলি এখন?'

গাড়োয়ান একটু কী যেন ভাবিল, তাহার পর বলিল, 'পারব হুজুর। দেন!'

জাহাঙ্গির চিঠিটা ও দশ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'কাল সন্ধ্যায় আমায় এইখানে পাবি এসে। কী উত্তর দেয়, নিয়ে আসবি। তাহলে আরো দশ টাকা বখশিশ, বুঝলি?'

গাড়োয়ান আনন্দ-গদগদ কণ্ঠে বলিল, 'হুজুর মা বাপ! কালই সনঝে বেলা আমি হাজির হব এসে। হুজুর এই খেনেই থাকবেন তো?'

জাহাঙ্গির 'হু' বলিয়া অন্যমনস্কভাবে স্টেশনের ভিতরে চলিয়া গেল।

ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়াই সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। সেখানে ইজিচেয়ারে শুইয়া সাহেবি পোশাকপরা একজন লোক নিশ্চিন্ত আরামে সিগার ফুঁকিতেছিল। জাহাঙ্গির লোকটিকে আর একবার ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর কাছে গিয়া বলিল, 'প্রমত-দা এখানে?'

প্রমত্তও চমকিয়া উঠিয়াছিল। জাহাঙ্গিরকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 'চুপ! এখানে প্রমত-দা বলে কেউ আসেনি!' বলিয়াই চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'বস এইখানে! তারপর তুই এখানে কোথা?'

জাহাঙ্গির সমস্ত বলিল।

প্রমত্ত সমস্ত শুনিয়া হাসিয়া বলিল, 'বেশ বেড়াচ্ছিস তাহলে উপন্যাসের নায়ক হয়ে! কিন্তু ভালো করিসনি জাহাঙ্গির তুই এখানে এসে! যাক, তুই আজই কলকাতা চলে যা। একটু পরেই ট্রেন আসবে!'

জাহাঙ্গির বিস্মিত হইয়া বলিল, 'আর আপনি?'

প্রমত্ত বলিল, 'আমার প্রশ্ন? আমার অন্য জায়গায় কাজ আছে।'

কী যে কাজ জাহাঙ্গিরের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। ইহা লইয়া আর কিছু প্রশ্ন যে সে করিতে পারে না, তাহাও সে জানে। তবু সে একটু ঘুরাইয়া বলিল, 'আমাকে যে কাল পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে প্রমত্ত-দা!'

বলিয়াই সে হাসিয়া বলিল, 'থুড়ি, মিস্টার চাকলাদার!'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'আমার সুট-কেসের লেখা নাম পড়ে ফেলেছিস বুঝি! কিন্তু দেয়ালগুলোরও চোখ-কান আছে রে! একটু সাবধানে কথাবার্তা বলবি। সে যাক, তুই এখানে থাকবি কেন, বলত! আমার জন্য তোর কোন চিন্তা নেই।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'আপনার নেই, কিন্তু আমাদের তো থাকা উচিত। তা ছাড়া—বলিয়াই একটু থামিয়া চক্ষু নত করিয়া বলিল, 'কাল চিঠির উত্তর আসবে আমার!'

প্রমত্ত হাসিল না। জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া অনেকক্ষণ কী ভাবিল। তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল, 'তবে তুই থাক। কিন্তু খুব সাবধান! পিছনে টিকটিকি লেগেছে! অবশ্য, তোর ভাবনা নেই! কেননা মুসলমান যুবককে তারা এখনো সন্দেহ করেনি। সাবধানের মার নেই।'

প্রমত্ত আবার যেন কী ভাবিতে লাগিল।

একটু পরে সে বলিয়া উঠিল, 'দেখ জাহাঙ্গির, তোর আচকান পায়জামা আছে সঙ্গে?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'আছে।'

প্রমত্ত বলিল, 'এখখুনি নিয়ে আয়!' বলিয়াই ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'আর বেশি সময় নেই! যা, শীগগির আন!'

জাহাঙ্গির তাহার আচকান পায়জামা আনিলে প্রমত্ত বাথরুমে ঢুকিয়া একটু পরে যখন তাহা পরিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন জাহাঙ্গির একটু জোরে হাসিয়া বলিল, 'আদাব আরজ মৌলবি সাব! আপকে ইসমে শরিফ!'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'কেফায়তুল্লা।' তারপর নিম্নকণ্ঠে বলিল, 'আমি যাচ্ছি এখনি! কেমন যেন গন্ধ পাচ্ছিরে! তুই এইখানেই ঘুমো। দরকার হলে ডাকব!' বলিয়াই প্রমত্ত টার্কি-ফেজ মাথায় দিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া গেল!

জাহাঙ্গির সেইখানে ইজি-চেয়ারে শুইয়া শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি প্রায় তিনটার সময় সে কাহার ঠেলায় জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সামনেই একজন ইউরোপিয়ান সাহেব। তাহার পিছনে তিন-চার জন বাঙালি বাবু।

সে একটু বিরক্ত হইয়াই ইংরাজিতে বলিল, 'আপনি কি চান? এরূপভাবে জাগাবার রীতি ভদ্রতা-বিরুদ্ধ!'

সাহেব একটু থতমত খাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'মাপ করবেন, আমি আপনাকে আমার বন্ধু মিঃ চাকলাদার মনে করেছিলুম। তিনি বোধ হয় এখানেই ছিলেন, বলতে পারেন, তিনি কোথায় গেছেন?'

জাহাঙ্গির তেমনি বিরক্তির সুরে বলিল, 'জানি না কে আপনার চাকলাদার। আমি কাউকেই দেখিনি এখানে।'

সাহেব আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল!

জাহাঙ্গিরের বুঝিতে বাকি রহিল না ইনি কোনো সাহেব!

এক অজানা আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। সে আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার বুকের কাছে তাহার শ্রেষ্ঠ বন্ধু—তাহার আত্মরক্ষার অস্ত্র আছে কিনা।

প্রমত্তকে সে জানিত। সে জানে, ইহাদের চক্ষে ধূলা দিতে এক জাহাঙ্গিরই যথেষ্ট, প্রমত্তের ন্যায় সেনানির দরকার করে না। তবু তাহার কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল!

হঠাৎ অন্য দ্বার দিয়া ঢুকিয়া প্রমত্ত বলিয়া উঠিল 'আস্‌সালোমো আলায়কুম! ক্যা কিয়া সাব শব্বরুয়া চলা গিয়া?'

জাহাঙ্গির লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'জি হাঁ! মগর আপ্ ইস্‌ওকত্ কেঁও'—বলিয়াই এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, 'আপনি সরে পড়ুন প্রমত্ত-দা, শ্যাঙাতরা নিশ্চয় এইখানেই কোথাও আছে!'

প্রমত্ত পরম নিশ্চিন্তভাবে চেয়ারে বসিয়া বলিল, 'তোকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না। তুই চল দেখি আমার সাথে, এখখুনি এক জায়গায় যেতে হবে।'

জাহাঙ্গির কোনো প্রশ্ন না করিয়া মিলিটারি কায়দায় ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল 'রেডি, স্যার।'

সমস্ত জিনিসপত্র স্টেশন মাস্টারের হেফাজতে রাখিয়া সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, একখানা মোটরের সম্মুখে বহুরূপী প্রমত্ত সন্ন্যাসীর সাজে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনে মোটরে উঠিয়া বসিলে মোটর বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিল।

জাহাঙ্গির বলিল, 'কি করতে হবে দাদা আমায়, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'আর কেউ হলে বলতাম না, আমি তোকে জানি বলেই বলছি। একটু দূরেই কোনো গ্রামে যাচ্ছি। যেখানে আমাদের কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে। পুলিশ তা টের পেয়েছে বলে খবর পেয়েছি। আজ ভোরের মধ্যেই তা সরিয়ে আর কোথাও রেখে যেতে হবে—আমার ওপর বজ্রপাণির এ হুকুম।'

জাহাঙ্গির আর কিছু প্রশ্ন করিল না। উত্তেজনা উৎসাহে তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'রাস্তায় যদি পুলিশের সঙ্গে দেখা হয়?'

প্রমত্ত উত্তর দিল না। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া রাস্তার দিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি থামাইতে বলিয়া একটি ক্ষুদ্র শিস্ দিল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ভেদ করিয়া চার পাঁচজন লোক আসিয়া নিঃশব্দে মোটরে বসিতেই আবার মোটর ছুটিতে লাগিল।

ঘণ্টাখানিক পরে তাহারা একটি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাঁশবনঘেরা একটি ক্ষুদ্র মেটে ঘরের সম্মুখে আসিয়া থামিল। জাহাঙ্গির সেই স্বল্প তারকালোকেই দেখিতে

পাইল, গাড়ি থামিবামাত্র একটি স্ত্রীলোক দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রমত্ত গিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল।

প্রমত্তের ইঙ্গিতে সকলে নামিয়া পড়িল এবং সকলের সাথে জাহাঙ্গিরও মহিলাটিকে প্রণাম করিল, কিন্তু সে যেন দায়ে পড়িয়া।

ঘরের ভিতরে গিয়া স্বল্প দীপালোকেই জাহাঙ্গির যে মহীয়সী জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখিল, তাহাতে এই নারীকে প্রণাম করিতে গিয়া তাহার মন যেটুকু বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার জন্য নিজেকে ধিক্কার না দিয়া পারিল না।

মহিলার বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশের বেশি হইবে না। পরনে শুধু একখানি পরিষ্কার সাদা ধূতি। যেন গায়ের রং এর সাথে মিশিয়া গিয়াছে। ঘাড় পর্যন্ত ছোট করিয়া কাটা চুল—অনেকটা বাবরি চুলের মত। তাহারি কতকগুলো ললাটে ও মুখের আশেপাশে আসিয়া পড়িয়াছে। বড় বড় চক্ষু কিন্তু তাহা যেন একটু অতিরিক্ত প্রখর, সহজে চোখের দিকে চাওয়া যায় না। চোখ যেন ঝলসিয়া যায়। মুখ পুরুষের মতো তৃপ্ত, মহিমোজ্জ্বল!

জাহাঙ্গির মনে মনে বলিল, 'নারী যদি নাগিনী হয়, তুমি নাগেশ্বরী।'

জাহাঙ্গিরের চিন্তায় বাধা পড়িল। প্রমত্ত নিম্নস্বরে, 'এদের সবকে বুঝি চেন না জয়তী দি?'

জাহাঙ্গির মনে মনে বলিল, 'তুমি সত্যই জয়তী দেবী!' জীবনে সে বুঝি এই প্রথম নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিল। জয়তী দেবী সকলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'এ ছেলেটিকে তো আগে দেখিনি!'

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'এ পথ-ভোলা ছেলে দিদি। এ আমাদের গোষ্ঠীর নয়।'

প্রমত্তের এই কথায় অন্যান্য সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। শুধু জয়তী দেবী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে জাহাঙ্গিরকে দেখিতে লাগিলেন! হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'তোমার মা বেঁচে আছেন?'

জাহাঙ্গির উত্তর করিল, 'আছেন।' জয়তী যেন আরো আশ্চর্য হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।

প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, 'দিদি বোধ হয় ভাবছ, মা থাকতে ওর অমন লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা কেন, না? সত্যিই ও লক্ষ্মীছাড়া। হাতের লক্ষ্মী পায় ঠেলতে পেরেছে বলেই ওকে দলে নিয়েছি।'

জয়তীর প্রখর চক্ষু স্নেহে কোমল হইয়া আসিল। স্নেহ-সিক্তকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি আমায় দিদি না বলে মাসিমা বলে ডেকো, কেমন?' বলিয়াই জয়তী অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।

জাহাঙ্গির ব্যতীত আর সকলেরই চক্ষু জলে পুরিয়া উঠিল! জয়তীর এই অনুরোধের অর্থ বুঝিতে তাহাদের বাকি রহিল না। জয়তীর ছোট বোন সন্তান-প্রসব করিয়াই মারা যায়। সে ছেলেকে জয়তী লইয়া আসিয়া মানুষ করেন। নাম রাখেন

পিণাকপাণি। সকলে 'পিণাকী' বলিয়া ডাকিত। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া গত বৎসর তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে! ফাঁসির মঞ্চেও সে জীবনের জয়গান গাহিয়াছে!

যেদিন পিণাকীর ফাঁসি হয়, সেইদিনই জয়তী গঙ্গাস্নান করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া স্বয়ং বজ্রপাণির কাছে স্বদেশি মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। আজ জয়তী বিপ্লবীদের শক্তি-স্বরূপা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

জয়তীর ঐ উক্তির পর সকলে এমনকি প্রমত্ত পর্যন্ত আশ্চর্য হইয়া দেখিল, জাহাঙ্গিরের সঙ্গে পিণাকীর বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

পিণাকীকে বিপ্লব-সঙ্ঘের সকলেই অতিরিক্ত স্নেহ করিত। সে ছিল তাহাদের দলের বয়োকনিষ্ঠদের অন্যতম। তাহা ছাড়া, সে যাইত সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসের কাজে সর্বাগ্রে।

মৃত্যুকে সে রাঙা উত্তরীয়ের মতো সারা গায়ে জড়াইয়া ধরিতে চাহিত!

তাঁহার ফাঁসির দিন বজ্রপাণি হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লবীদের প্রত্যেকে শিশুর মতো রোদন করিয়াছিল।

ফাঁসির পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'তুমি কি কাউকে দেখতে চাও?'

পিণাকী হাসিয়া বলিয়াছিল, 'চাই, কিন্তু তুমি তো দেখাতে পারবে না!'

ম্যাজিস্ট্রেট তাহার শিশুর মতো মুখের পানে তাকাইয়া জোরের সঙ্গে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয়ই পারব! বল কাকে দেখতে চাও?'

পিণাকী তেমনি মধুর হাসিতে মুখ আলো করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি চাই ভারতের স্বাধীনতা দেখতে! পারবে দেখাতে?'

ম্যাজিস্ট্রেট তৎক্ষণাৎ তাহার মাথার টুপি খুলিয়া বালককে অভিবাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিয়াছিল, 'আমি তোমায় প্রণাম করি বালক। মৃত্যুমঞ্চই তোমার মতো বীরের মৃত্যুঞ্জয়ী সম্মান। তোমার মতো বীরের বন্দনা করবার সম্বল জীবনের নাই।'

আজ জয়তী দেবীর জাহাঙ্গিরের প্রতি এই অদ্ভুত অনুরোধ শুনিয়া সকলের সেই সব কথাই স্মরণ হইতে লাগিল!

একটু পরেই জয়তী আসিয়া বলিলেন, 'তোমরা তোমাদের কাজ কর গিয়ে, আমি একটু ওর সঙ্গে আলাপ করি।'

প্রমত্ত অন্যান্য ছেলেদের লইয়া চলিয়া গেল। জাহাঙ্গির একা কেমন একটু অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

জয়তী কাছে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, 'তোমায় পিণাকী বলে ডাকব, কেমন?'—কণ্ঠ তাঁর যেন ভাঙিয়া আসিল।

জাহাঙ্গিরের চক্ষে এতক্ষণে যেন এই রহস্যের কুহেলিকা কাটিয়া গেল। এখন সে বুঝিতে পারিল, কেন জয়তী দেবী তাহাকে মাসিমা বলিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারও চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ সে বলিল, 'তুমি কি বীর পিণাকীর মাসিমা?'

জাহাঙ্গিরের এই তুমি সম্ভাষণে এমন পাষাণ-প্রতিমার মতো কঠিন জয়তীও যেন ভাঙিয়া পড়িলেন। জাহাঙ্গিরের শিরচুম্বন করিয়া বলিলেন; 'হাঁ বাবা, আমিই সে দুর্ভাগিনী।'

তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, 'তোকে দেখতে অনেকটা পিণাকীর মতো।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'তুমি দুর্ভাগিনী নও মাসিমা, ভাগ্যবতী। কিন্তু সে যাক, তোমায় না ভেবে ছুঁয়ে ফেলেছি, তোমায় হয়তো আবার স্নান করতে হবে!'

জয়তী বেদনায় নীল হইয়া বলিলেন, 'ও কথা বলিসনে বাবা, ও কথা শুনলেও পাপ হয়। মানুষকে মানুষ ছুঁলে স্নান করতে হয়, মানুষের এত বড় অবমাননাকর শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল বলেই আমাদের এই দুর্দশা। জানিনে তুই কি জাত, কিন্তু তুই যদি হাড়ি-ডোমও হতিস তা হলেও তোকে ছুঁতে এতটুকু ইতস্তত হত না আমার! ওরে, জন্মটা তো দৈব। যেদিন আরেক জনকে আরেক জাতের ভেবে ঘৃণা করব, সেই দিনই আমার স্বাধীনতার মন্ত্র আমার কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে! তা ছাড়া, তোরা তো আগুনের শিখা, তোদের ছোঁয়ায় সেসব অশুচি শুচি হয়ে ওঠে বাবা!'

জাহাঙ্গির অবাক হইয়া জয়তীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'এই যদি আমাদের অন্তরের কথা হয় মাসিমা, তা হলে এই আমাদের সবচেয়ে বড় মন্ত্র। আর শুধু এই মন্ত্রের জোরেই বিনা রক্তপাতে আমরা ভারত স্বাধীন করতে পারব।'

এমন সময় অন্য ঘর হইতে জয়তীর একমাত্র কন্যা ঘুম হইতে জাগিয়া 'মা মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

জয়তী কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এইখানে উঠে আয় চম্পা, তোর একজন নতুন দাদা এসেছে।'

চম্পা আলুথালু বেশে তাহার মাতার নিকট আসিয়া বলিল, 'কই মা?' বলিয়াই জাহাঙ্গিরকে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল।

জয়তী মলিন হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'ওকে অনেকটা পিণাকীর মতো দেখাচ্ছে, না?'

পিণাকীর নাম করিতেই চম্পার দুই চোখে অশ্রুর বান ডাকিল। সে সেই অশ্রুসিক্ত চক্ষু দিয়া জাহাঙ্গিরকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'দাদাকে কি বলে ডাকব মা?'

জয়তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'দাদাকে আবার কী বলে ডাকবি? দাদাই বলবি!'

চম্পা লজ্জা পাইয়া জয়তীর পশ্চাতে আসিয়া মুখ লুকাইল!

জাহাঙ্গির দেখিল, চম্পা যেন শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। সহসা তাহার ভুণীকে মনে পড়িল। ইহারা মায়াবিনীর জাত! ইহারা সকল কল্যাণের পথে মায়াজাল পাতিয়া রাখিয়াছে। ইহারা গহন-পথের কণ্টক, রাজপথের দস্যু। সে নিঃশব্দে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, দূরে বনানীর অন্ধকারে নিশীথের চাঁদ মলিন-মুখে অস্ত যাইতেছে, আর পূর্ব-গগন নবারুণের উদয় আশায় রাঙিয়া উঠিয়াছে!

বারো

জাহাঙ্গির কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াই দেখে দুই-তিনখানা টেলিগ্রাম আসিয়া পড়িয়া আছে। একখানা দেওয়ানজির, দুইখানা তাহার মায়ের প্রেরিত। পর পর দুইখানা টেলিগ্রাম করিয়াও তাহার উত্তর না পাইয়া স্নেহ-বৎসলা জননী আবার 'রিপ্লাই-পেড' টেলিগ্রাম করিয়াছেন। এইবার উত্তর না দিলে দেওয়ানজিকে লইয়া তিনি নিজেই কলিকাতা আসিয়া তাহাকে পাকড়াও করিবেন—এই ইঙ্গিতও দিয়াছেন টেলিগ্রামে।

জাহাঙ্গিরের মাতা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না যে তাঁহার পুত্র বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছে বা সে কলিকাতায় মাঝে মাঝে থাকে না ঐ মন্ত্রের উপাসনার জন্য। কাজেই তিনি মনে করিয়াছিলেন, হয় জাহাঙ্গির পীড়িত, নয় সে ইচ্ছা করিয়াই উত্তর দিতেছে না।

জাহাঙ্গির ভয়ে ভয়ে শেষ টেলিগ্রামের তারিখ দেখিয়া বুঝিল, ও টেলিগ্রামও দুইদিন আগেকার। সে সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইল, টেলিগ্রাম খোলা দেখিয়া। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে জানিতে পারিল না, কে তাহার টেলিগ্রাম খুলিয়াছে। শেষে আবার বুঝিতেও বাকি রহিল না, এ কীর্তি কাহাদের। সে শ্রান্তভাবে ধূলি-ধূসরিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে গলা-ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল, 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে!'

তখন কুম্ভীর মিঞা ছাড়া আর প্রায় সকলেই আপন আপন কাজে বা কলেজে চলিয়া গিয়াছে। কাজেই কেহ আসিয়া আর জাহাঙ্গিরের অনুপস্থিতি লইয়া প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিল না।

আসিল কেবল কুম্ভীর মিঞা তাহার ভুঁড়ি আন্দোলিত করিতে করিতে। কিন্তু সে ঘরে ঢুকিয়া জাহাঙ্গিরের মূর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। জাহাঙ্গিরের এমন ছন্নছাড়া মূর্তি সে যেন আর কখনো দেখেনি। দুঃখে, বেদনায় বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জাহাঙ্গির বুঝিতে পারিয়া গম্ভীরভাবে কুম্ভীর মিঞার ভুঁড়িতে তাকিয়া থাপড়ানোর মতো করিয়া থাপ্পড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি উল্‌ঝলুল! দেখছিস কি হ্যাঁ করে? আমি কি তোর বৌ-এর ছোট বোন?'—বলিয়াই সিগারেট-কেস আগাইয়া দিয়া হুস করিয়া তাহার মুখের উপর একরাশ ধোঁয়াও ছাড়িয়া দিল।

অন্য দিন হইলে কুম্ভীর মিঞা ছাড়িয়া কথা বলিত না। কিন্তু আজ সে সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া গেল। সে কত কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কত কথা জানিবে বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সব যেন তাহার ঘুলাইয়া গেল জাহাঙ্গিরের এই চেহারা দেখিয়া। জাহাঙ্গিরকে সে এতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, তবু সে যেন বিস্ময়ের দেশের রাজকুমার মায়াবি। উহাকে শুধু দেখিতে হয়, বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। অথবা সে উন্মাদ।

ভাবিতে ভাবিতে সে নীরবে সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল। জাহাঙ্গিরও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ঘুমে তখন তাহার চক্ষু যেন জুড়াইয়া আসিতেছে। পুলিশের চক্ষে ধুলা দিবার জন্য আজ তিনদিন তিনরাত্রি তাহার নিজের চক্ষুকে নিস্তন্দ্র নির্ঘুম করিয়া রাখিতে হইয়াছে। সে জানিত, সে এতটুকু অবহেলা করিলে তাহার সহিত আরো বহু যুবকের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সে ক্ষণে ক্ষণে নানান রূপের আড়ালে নিজেকে লুকাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু আজ আর যেন সে পারে না।

সবচেয়ে বেশি ভয় হইতে লাগিল তাহার মাতার টেলিগ্রাম দেখিয়া। যদি তিনি কলিকাতায় আসিয়া পড়েন? কিন্তু কেন যে তাহাকে কুমিল্লা যাইবার জন্য এত অনুরোধ, তাহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার মা তো জানেন, জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ এবং অপারগ—দুই-ই।

কুম্ভীর মিঞা এক নিঃশ্বাসে তিন-তিনটা সিগারেটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'এই! চা খাবি?'

জাহাঙ্গির লাফাইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'দেনা ভাই লক্ষ্মীটি।' কুম্ভীর মিঞা ম্লান হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। একটু পরে চা লইয়া আসিয়া দেখিল, জাহাঙ্গির শেভ করিতে বসিয়া গিয়াছে।

এক পাশের আধ-কামানো গাল লইয়া জাহাঙ্গির চায়ের কাপ টানিয়া লইল। চা খাইতে খাইতে বলিল, 'দেখছিস মুখের অবস্থা? আজ সাত দিন ক্ষৌরী না করে মুখ যেন ধান-কাটা মাঠের মতো হয়ে উঠেছে!' বলিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'হাত বুলোতে মনে হচ্ছিল, যেন কাটা-ধানের নাড়ার ওপর দিয়ে বাবলা গাছ টেনে নিয়ে যাচ্ছে!'—আবার সেই হাসি!

কুম্ভীর মিঞা এতক্ষণে যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া বলিল, 'উঃ, এতক্ষণে যেন মেঘ কাটল! ভাগ্যিস চায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, নৈলে এমন বিপদে বিপদহন্ত্রীর বেশে আর কে দেখা দিত!'—বলিয়াই রাস্তার কাঁসারীর কংস নিনাদের মতো বাজখাঁই হাসি!

জাহাঙ্গিরও সে হাসিতে যোগদান করিয়া বলিল, 'যা বলেছিস! চা আর সিগারেট--যেন একসঙ্গে বৌ আর শালি!—আঃ কি চা-ই করেছিস! তোর শালির বিয়েতে আমি চালনি দিয়ে জল বয়ে দিব!' কুম্ভীর মিঞা জাহাঙ্গিরের উরুতে এক রাম-থাপপড় কষাইয়া বলিয়া উঠিল, 'তুই কি এমনই সতী!'

জাহাঙ্গির উরুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, 'তুই হিম হতে পারিস, তাই বলে আমি দুর্যোধন নই! এখনি উরুভঙ্গ হয়েছিল আর কি!'

কুম্ভীর মিঞা এতক্ষণে যেন কূল পাইয়া বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা দুর্যোধনের মতো কোন হ্রদে লুকিয়েছিলে বলত?'

জাহাঙ্গির কোনো উত্তর দিল না। চা শেষ করিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে দাড়ি কামাইতে লাগিল।

কুম্ভীর মিঞা বলিয়া উঠিল, 'আরে তোমায় খবর দিতে ভুলে গেছি তোমাদের দেওয়ানজি এসেছেন যে!'

জাহাঙ্গির চমকিয়া উঠিতেই খানিকটা গলা কাটিয়া গেল। ক্ষতস্থানটা চাপিয়া ধরিয়া জাহাঙ্গির বলিয়া উঠিল, 'কোথা তিনি? কখন এসেছেন?'

কুম্ভীর মিঞা বিস্মিতনেত্রে জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল; 'তা তো জানিনে। তবে তিনি কাল দু-তিনবার এসেছিলেন তোমার খোঁজ করতে। আজ সকালে একবার এসেছিলেন যেন। যাক, তোর চিন্তার কিছু নেই। তিনি নিজেই আজ আর একবার অন্তত আসবেন।'

জাহাঙ্গির কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল, এবং একটু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে দাড়ি কামাইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। স্নান করিয়া ফিরিয়া সে শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'আমি এখন একটু ঘুমুব! শরীরটা কেমন খারাপ করছে যেন। দেওয়ানজি এলে আমায় উঠিয়ে দিস।'

জাহাঙ্গিরের যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা গড়াইয়া পড়িয়াছে। ঘুম ভাঙিতেই দেখিল সামনে চেয়ারে বসিয়া দেওয়ানজি। জাহাঙ্গির উঠিয়া শশব্যস্তে তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।

দেওয়ানজি তাহার একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা, বেগম মা অস্থির হয়ে উঠেছেন। তুমি এখনি চল। আজ দুদিন তিনি না খেয়ে আছেন।'

জাহাঙ্গির কুঁজো হইতে জল গড়াইয়া লইয়া চোখ-মুখে দিতে দিতে বিস্ময়ান্বিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'মা? মাও এসেছেন নাকি?'

দেওয়ানজি বলিলেন, 'হাঁ বাবা, তোমার কোন খবর না পেয়ে অসুখ-বিসুখ হয়েছে মনে করে কাল আমরা এসেছি। এসে অবধি তোমায় খুঁজছি। তুমি সাতদিন ধরে এখানে নেই শুনে তিনি সেই যে শয্যা নিয়েছেন আর ওঠেননি। কেউ এতটুকু পানি মুখে দিতে পারেনি।'

জাহাঙ্গির জামা পরিতে পরিতে ক্লান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন বাড়িতে উঠেছেন এসে?'

দেওয়ানজি উঠিতে উঠিতে বলিলেন, 'লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। অন্য বাড়ি তো সব ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে। ওটাই শুধু খালি হয়েছে মাত্র সেদিন।'— বলিয়াই একটু থামিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি তো কোনো খবরই রাখ না বাবা। নিজের বাড়ি ঘরগুলোরও না।'

জাহাঙ্গির উচ্চবাচ্য না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দেওয়ানজি নামিতে নামিতে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, 'কি চেহারা হয়েছে তোমার, দেখ তো! কে বলবে নওয়াব বাড়ির ছেলে? যেন পথের ভিখিরী!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমি ত সত্যই ভিখিরী দেওয়ান সাহেব! বাপের জমিদারি, ও ত আমি অর্জন করিনি!'

জাহাঙ্গিরের চোখে-মুখে এক অব্যক্ত-ব্যথার ছাপ ফুটিয়া উঠিল। দেওয়ানজি কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের মতো তাকাইয়া থাকিলেন।

মোটরে যাইতে যাইতে জাহাঙ্গির সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা দেওয়ান সাহেব, খবর সব ভালো তো? এত ঘন ঘন টেলিগ্রাম করা কেন বলুন তো! এ অকর্মণ্যকে নিয়ে কেন এ অনর্থক টানাটানি?'—তাহার কথার সুরে তিক্ত শ্রান্তি ফুটিয়া উঠিল।

দেওয়ানজি স্টেট চালাইয়া ঝানু হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানুষের বিশেষ করিয়া আজকালকার যুবকদের অন্তর লইয়া কখনো তাহার মাথাব্যথা হয়ও নাই, আর চেষ্টা করিয়াও ওর কূল পান না। তবু তাঁহার হঠাৎ মনে হইল তরুণ যুবক হয়তো-বা কোথাও লভ-টভ করিয়া বসিয়াছে। তিনি মনে মনে এ রোগের ওষুধের কথা চিন্তা করিয়া প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।

বলিয়া উঠিলেন, 'খবর ভালোই বাবা। শুধু আমাদের বেগম-মা জিদ ধরেছেন, তিনি মক্কা যাবেন হজ করতে। আর এক হপ্তার মধ্যেই জাহাজ ছাড়বে। তিনি তোমায় সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে যেতে চান। তাই এত তাড়াতাড়ি।'

জাহাঙ্গির আর শুনিতে পারিল না। কেমন যেন এক অজানা আতঙ্কে তাহার সারা দেহ-মন শিহরিয়া উঠিল। অসহায়ভাবে মোটরে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'দেওয়ান সাহেব, এখন থাক, মার কাছে গিয়েই সব শুনব!'

তেরো

জাহাঙ্গির আসিয়া পৌঁছিতেই তাহার মাতা একবোরে তাহাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, 'খোকা, এ কি চেহারা হয়েছে তোর?'

জাহাঙ্গির কিছু না বলিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। জননী উদগত অশ্রু সংবরণ করিতে করিতে নীরবে ছেলের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

জাহাঙ্গির হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, 'তোমার খাওয়া হয়নি দুদিন থেকে! আগে খেয়ে নাও, তারপর সব কথা হবে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রের পীড়াপীড়িতে তাঁহাকে উঠিয়া খাইয়া আসিতে হইল।

জাহাঙ্গির ততক্ষণে ঘরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল, সত্য-সত্যই কোনো দূরদেশে যাইবার জন্যই তাহার মা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না, মায়ের এ অভিমান কাহার উপর! সে সংসারী হইল না, ঘর-সংসারের কোনো-কিছু দেখিল না শুনিল না বলিয়াই মা স্বেচ্ছায় সংসার হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। এ হয়তো অভিমান করিয়া পুত্রকে শাস্তিই দিতেছেন তিনি। জাহাঙ্গির গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া একটা সোফায় বসিয়া অস্ত-আকাশের রংয়ের খেলা

দেখিতে লাগিল। রঙ তো নয়, ও মায়া, স্বপ্ন। ও রং লাগিতেও যতক্ষণ মুছিতেও ততক্ষণ।

ঐ গোধুলি-বেলার রঙ-এর মতো সুখের স্বপ্নের ছোপ তাহার চিত্তে লাগিয়াই আবার পরক্ষণে মুছিয়া যায়। ঐ অস্ত-আকাশের মতোই নির্লিপ্ত তার মন। কত রঙ আসে, খেলিয়া যায়, তারপরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় কঠোর বাস্তবের দিবালোকে। এই রঙ-এর মায়ায় সে ভুলিবে না। ইহাকে প্রশ্রয় দিবে না। তাহার কাছে শুধু দিনের আলো আর রাতের আঁধারই সত্য। নিষ্ঠুর বাস্তবতা আর অসীম দুঃখ সূর্যালোক আর আঁধারের মতো তাহার জীবনকে জড়াইয়া আছে। ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছু তাহা কেবলি রঙ-এর মায়া, মরীচিকার প্রতারণা।

সে কি করিবে ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু বেশি ভাবিবার অবকাশও সে পাইল না। মাতা খাইয়া আসিয়া পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, 'সত্য বল দেখি খোকা, তোর কি হয়েছে!' দিন দিন তোর চেহারাই বা অমন হচ্ছে কেন? কি হয়েছিস, একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি।'

জাহাঙ্গিরের মেসে বড় আয়না ছিল না। তাছাড়া চুলটুল চিরুনিও করে সে সাধারণত কম। করিলেও এত অন্যমনস্কভাবে করে যে তাহার নিজের চেহারার দিকে লক্ষ করিবার মতো মনের অবস্থা তাহার থাকে না। মায়ের কথায় হঠাৎ সামনের বড় আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজেকে এতদিন পরে ভালো করিয়া দেখিল। দেখিয়া লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। সত্যই তাহার চেহারা অতিমাত্রায় লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গিয়াছে। এই ঘরে তাহাকে যেন মানাইতেছিল না।

তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, রাজবাড়িতে ভিক্ষুককে যেমন অশোভন দেখায়, তাহাকে তেমনি বিশ্রী বেখাপপা দেখাইতেছে। সে মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল!

সে জানে রাজ-ঐশ্বর্য এই ঘর-বাড়ি ধন-দৌলত সমস্ত তাহারই একদিন হইবে। অথবা ইচ্ছা করিলে আজই সে এ সবের মালিক হইতে পারে। তবু তাহার মন কেন যেন কেবলি বলিতে লাগিল, এ ঐশ্বর্য আর কারুর, তোর নয়, তোর নয়! কেন যেন তাহার মন এত বড় অধিকার, এত বেশি ঐশ্বর্যকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না, তাহা সে নিজেই জানে না।

দেশের কাজে নিয়তই তাহাকে দুঃখী আতুরদের মাঝেই বেশির ভাগ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। তাহাদের শত অপরাধের মাঝে থাকিয়াও তো সে এ অস্বস্তি অনুভব করে নাই। বরং পরম শান্তির সঙ্গে এই দুঃখের দৈন্যের বুকে বসিয়া সে ভাবিয়াছে, সে যেন এই দৈন্য-দুঃখপীড়িত দলেরই একজন। ঐশ্বর্যের প্রলোভন মায়া তাহার জন্য নয়। সে ঐশ্বর্যকে ঘৃণা করে, ঐশ্বর্যশালীদের ঘৃণা করে। উহারাই সকল পাপের মূল। উহারাই শয়তানের গুপ্তচর। ঐ ঐশ্বর্যই সকল অকল্যাণের হেতু।

তাহার জন্মবৃত্তান্ত আজ তাহার কাছে অবিদিত নাই। ইহা লইয়া প্রথমে যে চিত্তবিক্ষোভ হইয়াছিল, তাহারও অনেকটা আজ প্রশমিত হইয়া গিয়াছে—তাহার

আত্ম-অবহেলায় আত্ম-নির্যাতনে ও প্রমত্তের উপদেশে। তবু তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ যদি তাহার মা ঐ দুঃখীদের মতোই একজন হইত, সে আজ এমন করিয়া মাকে পর ভাবিতে পারিত না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, এই বাহিরের ঐশ্বর্যই তাহার অন্তরের ঐশ্বর্যকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। মনে মনে বলিল, দেবতার অভিশাপের মতোই দেবতার বরও ব্যর্থ হইবার নয় ; সুতরাং এ বরের বর্বরতা যেদিন তাহার স্কন্ধে আসিয়া চড়িবে সেদিন সে যেন তাহাকে পরিপূর্ণ চিত্তে অগাধ জলে বিসর্জন দিতে পারে।

এই সোনার লঙ্কাকে দগ্ধ করিতে পারে। বহু সীতার চোখের জলে এ লঙ্কা কলঙ্কিত।

বেদনাতুর আঁখি তুলিয়া মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ভাবছিস খোকা অমন করে? কি হয়েছিস তুই? কেবলি কি যেন ভাবছিস! কথা কইছিস অন্যমনস্ক হয়ে। যেন অন্য বাড়ির ছেলে। আমার যে কত কথা আছে তোর সাথে!'

জাহাঙ্গির ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'বড্ডো শরীরটা খারাপ লাগছে মা! আমি একটু শুই, শুয়ে শুয়ে সব শুনব তোমার। তাছাড়া পরীক্ষা কাছে কিনা, এবার পাশ করতে পারব কিনা ভাবছি।'

মাতা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'দেখ, মার মন অন্তর্যামী। আমার কাছে তোর আর লুকাতে হবে না। তোর মনের কথা না বলিস না-ই বললি, তবু এ লুকোবার চেষ্টা করিসনে। আর পরীক্ষায় ফেলের কথা? তুই তো চিরকাল না পড়েই পাশ করে এলি। আমি জানি, এবারও তুই পাশ করবি। কিন্তু তুই তো ও কথা ভাবছিসনে, অন্য কি কথা ভাবছিলি বল?'

জাহাঙ্গির বিছানায় শুইয়া পড়িল, উপরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিল।

একটু থামিয়া ধরা-গলায় মা বলিয়া উঠিলেন, 'খোকা আমি মা, আমি তোর মনের সব কথা বুঝি। আচ্ছা বাবা, তোর কথায় আমি তো খেলুম, এখন তুই এ বাড়ির কিছু খাবি কি? তুই পেটের ছেলে, তবু যেন ও অনুরোধটুকু করতেও আমার ভয় হয়!'— বলিতে বলিতে কান্নায় মাতার স্বর জড়িত হইয়া গেল!

জাহাঙ্গিরকে কে যেন চাবুক দিয়া আঘাত করিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'মা! মা! তোমার পায়ে পড়ি, আর অমন করে বলো না, আমিও আজ তিন দিন থেকে শুধু চা খেয়ে আছি। এতক্ষণ বলিনি। খাবার আন, তুমি খাইয়ে দেবে!'

মা জাহাঙ্গিরকে বুকে জড়াইয়া 'খোকা' বলিয়া ডাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, 'কি নিষ্ঠুর তুই খোকা, নিজে না খেয়ে আছিস তিন দিন, আর তা লুকিয়ে আমায় মাথার দিব্যি দিয়ে খাওয়ালি?'

জাহাঙ্গির দুষ্টু ছেলের মতো আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, 'বা রে, তুমি বুঝি জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি খেয়েছি কিনা?'

চোখে আঁচল দিয়া মাতা চলিয়া গেলেন। পরিপাটি করিয়া ছেলেকে খাওয়াইবার পর মাতা বলিলেন, 'তুই এখন শো দেখি। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সব কথা বলি।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'আর সব কথা বলতে হবে না তোমার। আমি সব জানি। এরি মধ্যে হাজিবুড়ি হতে যাচ্ছ, এই তো!'

মাতা হাসিয়া বলিলেন, 'তা বুড়ো তো হয়েছি বাবা। এইবার তোর জিনিস তুই নে। আমি আর যক্ষের ধন আগলাতে পারিনে।'

জাহাঙ্গিরও তরল হাসি হাসিয়া বলিল, 'অর্থাৎ যক্ষ ভূত হয়ে আমিই এ টাকাকড়ি নিয়ে পাহারা দিই! তা মা, জ্যান্ত ছেলেকে তো যক্ষ দেওয়া যায় না!'

মা ছেলের মুখ চাপিয়া বলিলেন, 'তুই থাম খোকা। ষাট! বালাই! নিতে হবে না তোকে কিছু। দেওয়ান সাহেব সব দেখবেন। তুই ঘরেরও হবিনে। অথচ আমায়ও মুক্তি দিবিনে। আমি কতদিন আর এ শাস্তি বইব, বল তো?'

জাহাঙ্গির দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা মা, আমি যদি তোমার বৌমা এনে দিই, তাহলে হজ্জ করতে যেতে পারবে?'

মা যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া বলিলেন, 'তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক খোকা! ও অদৃষ্ট নিয়ে আমি আসিনি। বাড়িতে যদি আমার বৌমা আসে, তুই ফিরে আসিস, তাহলে কাজ কি আমার মক্কার হজ্জে! ওই হবে আমার মক্কা-কাবা সব!'

জাহাঙ্গির হো-হো করিয়া মায়ের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, 'বল কি মা, তোমার বৌমাই হবে সব! কাবার চেয়েও বড়!—বলিয়াই কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'থাক, আমিই বানে ভেসে এসেছিলুম!'

মা এইবার রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'চুপ কর হতভাগা ছেলে! যা নয় তাই বলা হচ্ছে!'—বলিয়াই স্নেহবিগলিত স্বরে বলিলেন, 'সত্যি খোকা বল, তুই আমার ঘরে বৌ এনে দিবি? আর ভূতের মতো একলা বাড়ি আগলাতে পারিনে! কেমন? তা হলে জিনিসপত্র খুলতে বলি?'—বলিয়াই হাঁক-ডাক দিতে আরম্ভ করিলেন, 'ওরে মোতিয়া, দেওয়ানজিকে একবার খবর দে তো!'

মোতিয়া বাড়ির পুরাতন ঝি। সে এতক্ষণ সব শুনিতেছিল আড়ালে থাকিয়া। এই খোশখবরে সে আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, 'বেগম আম্মা, আপনি দেইহ্যা বুঝবার পারছেন না, ভাইজানের মুখ কামান শুরুষকু অইয়্যা গিয়াছে! জোয়ান পোলার শাদি না দিলে সে অই ব্যাওয়া আইয়্যা যাইব না?'

জাহাঙ্গির হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। মাও হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'তুই যা দেখি, আগে দেওয়ান সাহেবকে ডেকে আন, তারপর তোর ভাইজানের শাদির কথা হবে।'

জাহাঙ্গির বলিয়া উঠিল, 'তার আগে মা তোমার সব কথা ভালো করে শোনা দরকার!'

মোতিয়া তাহার কাজলায়িত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জাহাঙ্গিরের দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেল।

মাতা পুত্রের রুক্ষ চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন, 'কতদিন তেল মাখিসনে খোকা, বল তো! তুই কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবি নাকি শেষে?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'কিন্তু তুমি তো সন্ন্যাসী হতে দেবে না। সে যাক, তুমি যে আসল কথাটাই শুনতে চাচ্চ না!'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'সে কথা না শুনেই আমি বুঝেছি। সে মেয়েটি কোথায় থাকে বল, তারপর আমার যা করবার আমি করব!'

জাহাঙ্গির লজ্জিত হইয়া বলিল, 'তুমি যা মনে করছ মা তা নয়। আমি তোমার কাছে কিছু লুকোব না। সব শুনে তুমি যা করতে বলবে তাই করা যাবে।'

জাহাঙ্গির হারুনদের বাড়ি যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উন্মাদিনী মাতার কীর্তি পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। বলিল না শুধু তাহার বিপ্লবীদলের সংশ্লিষ্ট থাকার কথা।

মাতা বিস্ময়াভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কোনো কথা উচ্চারিত হইল না। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখে আনন্দ ও শঙ্কার আলোছায়া খেলিয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ জাহাঙ্গির বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু মা তাকে কিছুতেই এ বাড়িতে আনা যেতে পারে না। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি—সে অতিমাত্রায় অহঙ্কারী মেয়ে। আমার মা গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে আনলে তবে নাকি তিনি আমাদের ঘরে শুভ পদার্পণ করলেও করতে পারেন। বিষ নেই মা, কিন্তু ফণা-আস্ফালন আছে!'

মা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'সে ঠিকই বলেছে খোকা। তা যদি সে না বলত, আমি তাকে আনবার কথা ভাবতে পারতুম না। যে সাপ ফণা ধরে—তার বিষও থাকে, সে জাতসাপ।'

জাহাঙ্গির ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি কি তাকে এ বাড়িতে আনবে মা?'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'তা আনতে হবে বৈ-কি! খোদা নিজে হাতে যে সওগাত পাঠিয়েছেন তাকে মাথায় তুলে নিতে হবে।'

জাহাঙ্গির ক্লান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু মা আমি তো তাকে বিয়ে করতে পারি না। তাকে কেন, কাউকেই বিয়ে করবার অধিকার আমার নেই!'

মা চমকিয়া উঠিয়া কি ভাবিলেন। তাহার পর আদেশের স্বরে বলিলেন, 'তোর তো বিয়ে হয়ে গেছে খোকা। তুই তাকে অস্বীকার করতে পারিস, কিন্তু সে মেয়েকে না দেখলেও তোর কাছে তার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে মনে হচ্ছে—সে তোকে অস্বীকার করতে পারবে না। তুই যদি তাকে না নিস, সে তার নিয়তিকে মেনে নিয়ে চিরকাল দুঃখভোগ করবে। জানি না, তার অদৃষ্টে কি আছে, কিন্তু আমার ছেলে যদি তার কাছে চির-অপরাধীই থেকে যায় আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!'

জাহাঙ্গির শূন্যদৃষ্টিতে একবার তাহার মাতার পানে চাহিয়া অসহায়ভাবে শুইয়া পড়িল।

মা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'কিন্তু তোর এত ভয় কেন খোকা? সে কি সুন্দরী নয়? না অন্য কারণে তোর মনে ধরেনি?'

জাহাঙ্গির রুগ্ন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'না মা, তা নয়। তার মতো সুন্দরী মেয়ে খুব কমই চোখে পড়ে। তুমি তো হারুনকে দেখেছ। তার চেয়েও সে সুন্দর। আর, মনে ধরার কথাই উঠতে পারে না, কেননা সে মনই আমার নেই। আমায় বিয়ে করতে নেই—তাই বলছিলুম।'

মাতা স্থিরদৃষ্টিতে পুত্রের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বিয়ে করতে নেই মানে? তুই কি ফকির-দরবেশের ব্রত নিয়েছিস?'

জাহাঙ্গির অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, 'কতকটা তাই!'

মাতার দুই চোখ অশ্রুতে পুরিয়া উঠিল! তবে কি পুত্র তাহার জন্ম-কাহিনীর বেদনা আজো ভুলিতে পারে নাই? আজো সে কি তার জন্মের জন্য অনুতপ্ত?

মোতিয়া আসিয়া খবর দিল, দেওয়ান সাহেব আসিয়াছেন। মাতা মোতিয়াকে বলিলেন, 'তুই তোর ভাইজানের কাছে থাক, দেওয়ান সাহেবের সাথে আমার কথা আছে।' বলিয়া পাশের কামরায় উঠিয়া গেলেন।

জাহাঙ্গিরের মনে ঝড় বহিতেছিল। তাহার মনে পড়িল, ভুণীর চিঠির কথা। পরদিন অর্থের লোভে গরুর গাড়ির সেই গাড়োয়ান সত্য সত্যই শিউড়ি স্টেশনে পত্রের উত্তর লইয়া আসিয়াছিল।

ভুণী লিখিয়াছিল : 'যদি মা আমাকে আপনার হাতে সঁপিয়া না দিতেন, আমি আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া অপমানজনক মনে করিতাম! আপনি যাহাকে চিরজীবনের নির্বাসন-দণ্ড দিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ তাহার প্রতি এই করুণার হেতু কি জানি না। আমি আপনাকে যতটুকু বুঝিয়াছি—তাহাতে আমার ধারণা—হৃদয় ছাড়া আপনার সকল কিছুই আছে। কিন্তু সে সকল লইয়া তো—নারী আমি—আমার কোনো লাভ নাই। দুঃখের সমুদ্র কলার ভেলায় আমরা ভাসিতেছিলাম। হঠাৎ আপনার বিপুল অর্ণব-পোত আমাদের কাছে আসিল। উদ্ধার পইবার আশা করি নাই, বরং মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল—তাহাই ফলিয়া গেল। আপনার জাহাজের ঢেউ লাগিয়া আমাদের কলার ভেলাখানি ডুবিয়া গেল। এখন তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য পথ নাই। যতদিন শক্তি থাকিবে যুদ্ধ করিব।

আপনি কূলে উঠিয়াছেন। যাহারা তরঙ্গে ডুবিতেছে—তাহাদের লইয়া এ বিদ্রূপ কেন?

ইচ্ছা করিলেই কি আপনার কূলে উঠিতে পারি? আপনি কি ভাবিয়া আমায় ডাকিয়াছেন, জানি না।

যে অধিকার আমার মা আপনাকে দিয়াছেন—সেই অধিকারের দাবি লইয়া যেদিন শুধু আপনি নন—আপনার অভিভাবিকা জননী আসিয়া ডাকিবেন-সেই দিন হয়তো

যাইতে পারি। কিন্তু তাহার পূর্বে নয়। লোক-সমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়া আপনার কাছে গেলে—আপনিই আমায় শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন না। অন্তরে যাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, বাহিরে দিনের আলোকে তাহাকে স্বীকার করিবার সৌভাগ্য যদি অর্জন করি, সেদিন আপনার আদেশে আমি মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়া দাঁড়াইতে পারিব।

আশা করি, আপনি আমায় ভুল বুঝিবেন না। এবং আর এরূপ ছেলেমানুষিও করিবেন না। আমার আত্মসম্মান আপনার আত্মসম্মানের চেয়ে কোনো অংশে হীন বা কম নহে।

বাহিরের ঐশ্বর্যের দম্ভ আমার নাই, আমরা দরিদ্র; কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্যের গৌরব আমার অন্তরে আপনার অপেক্ষা কম নাই।

আমাদের মাঝে যে অকূল পারাবার বহিয়া চলিল—তাহাই হয়তো আমার নিয়তি।

এ কূলে আপনি আসিয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মানিব। ওকূল হইতে আজ হাতছানি দিয়া ডাকিবেন না। মানুষেরই তো মন, একবার যদি ঝাঁপাইয়া পড়ি প্রলোভনের বশে একূল ওকূল দুইকূল হারাইব।

মা আপনার জন্য এখনো কাঁদেন। বলেন, মীনা এসে চলে গেল! ও আর আসবে না! যদি উপযুক্ত চিকিৎসা হইত, মা হয়তো ভালো হইলেও হইতে পারিতেন।

এইবার বাবার আর দাদার পাগল হইতে বাকি, আপনার অনুগ্রহে হয়তো তাহারও আর বিলম্ব নাই।

আপনি কি যাদু জানেন? মোমি আর মোবারক আজো আপনার ওকালতি করে! দুটো কাপড় আর দু-হাঁড়ি সন্দেশের এমনই মোহ! চির-দুঃখী কিনা!

আমাকে ভুলিয়াও যে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ; আরো ধন্যবাদ দিব, যদি স্মরণ করিয়া ভুলিয়া যান এবং এইরূপ অসম্মানজনক পত্রাদি প্রেরণ না করেন। ইতি—

চৌদ্দ

জাহাঙ্গির সুখ ও দুঃখের নানা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

জাগিয়া দেখিল, তাহার মাতা শিয়রে বসিয়া অতন্দ্রনয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছেন।

সে চোখ মেলিতেই মা বলিয়া উঠিলেন, 'জেগে উঠলি খোকা? ঘুমো আরো খানিক।'

জাহাঙ্গির উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'না মা, আর ঘুম হবে না।' বলিয়াই উসখুস করিতে লাগিল।

মা হাসিয়া বলিলেন, 'তুই কি ভাবছিস বলত! আমি কালই হারুনের বাড়ি যাব। দেওয়ান সাহেবও যাবেন, তোকেও যেতে হবে।'

জাহাঙ্গির কোনরূপে শুধু বলিতে পারিল... 'মা!'

মা বলিলেন, 'হাঁ, এ তোর মায়ের আদেশ।' বলিয়াই একটু থামিয়া বলিলেন, 'তোর পাঞ্জাবিটা ধুতে দিতে গিয়ে তার পকেটে বৌমার লেখা চিঠি দেখেছি। এমন মেয়ে পেয়েও যদি তুই মাথায় তুলে না নিস, বুঝব তোর কপালে বড় দুঃখ আছে। তুই না নিস, আমি আমার ঘরের লক্ষ্মীকে মাথায় করে নিয়ে আসব। আমি হজ করতে যাব বলে বেরিয়েছিলুম—খোদা আমার হজের পুণ্য রাস্তাতেই দিয়েছেন। তাকে না নিতে পারলে খোদা নারাজ হবেন!'

জাহাঙ্গির ফাঁসির আসামির মতো দয়া ভিক্ষার স্বরে বলিয়া উঠিল, 'দোহাই মা, আমায় এত বড় শাস্তি দিও না। এ শাস্তির অংশ তাকেও নিতে হবে তাহলে। তাছাড়া সে যা মেয়ে—তুমি গেলেও সে আসবে না—যদি না আমি তাকে সত্যিকার বিয়ে করি।'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'তোর বিয়েতে এত ভয় কেন খোকা বলত! তোকে তো কেউ ফাঁসি দিচ্ছে না!'—বলিয়া জিভ কাটিয়া 'ষাট ষাট বালাই' বলিয়া পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'কি বদখেয়ালি কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় মা গো!—যাক, এখন যদি তুই রাজি না হোস—তার ব্যবস্থাও দেওয়ানজি করে রেখেছেন। হারুনকে আমার স্টেটে এখন শ'তিনেক টাকার চাকরি দিয়ে ওদের সপরিবারে কলকাতায় নিয়ে আসব। চব্বিশ পরগণায় রায়েদের একটা বড় জমিদারি বিক্রি হচ্ছে—সেটা কিনে নেবার ব্যবস্থা করেছি। হারুন সেই স্টেটের ম্যানেজার হবে। তারপর যা করবার, করা যাবে।'

জাহাঙ্গির এক মুহূর্তে সব ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'সত্যি মা, তুমি হারুনকে নিয়ে আসবে? আহা, বেচারার বড় দুঃখ মা! এইবার বি.এ. দেবে, কিন্তু পাশ করলেও সে চাকরি পেত কোথায়? অথচ ওর চাকরি না হলে ওরা সব কটি প্রাণী উপোস করে মরবে! ওকে যদি চাকরি দিয়ে আনতে পার তাহলে আমার কৃতকার্যের অনেকটা অনুশোচনা কমে!'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'তোর পাপের প্রায়শ্চিত হয় বল।'—মা মনে মনে ভাবিলেন, ছেলে শুধু হারুনের চাকরির জন্যই খুশি হইয়া উঠে নাই, তাহার সাথে মেয়েটাও যে আসিবে, ইহাও তাহার খুশি হইয়া উঠার অন্যতম কারণ। তাঁহার মনের মেঘ অনেকটা কাটিয়া গেল! ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার খোকা বিবাহ ব্যাপারে অতিরিক্ত লজ্জা অনুভব করে। ও রকম খেয়াল অনেক ছেলেরই থাকে এবং তাহা কাটিয়া যাইতেও দেরি হয় না। তাঁহার খোকাও হয়তো মনে মনে রাজি আছে, শুধু লজ্জার খাতিরে এতটা করিতেছে। তাই অত্যন্ত প্রসন্ন মনে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, 'বেশি রাত্রি হয়নি এখনো। এখনি আমার সব দরকারি জিনিসপত্র কিনে ফেলতে হবে, তুইও আমার সাথে চল। দেওয়ানজি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন বাইরের ঘরে।'

জাহাঙ্গির উঠিতে উঠিতে বলিল, 'কিন্তু আমাকে আর যেতে হবে না তো সাথে?'

মা বলিলেন, 'সে কাল সকালে বোঝা যাবে। সকালেই ট্রেন, আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি হারুনের ওখানে। হারুন শিউড়ি স্টেশনে থাকবে! তুই মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হয়ে নে, আমি আসছি!' জাহাঙ্গির মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া চা খাইতে খাইতে নানা আকাশ-কুসুম কল্পনা করিতে লাগিল। তাহার আর সেখানে যাওয়া উচিত কিনা। অথচ সে না গেলে যদি তাহারা আসিতে অসম্মত হয়। সত্যই তাহার পাপের যদি কিছু মাত্র প্রায়শ্চিত্ত হয় হারুনকে দারিদ্রের কবল হইতে রক্ষা করিয়া, তাহা হইলেও তাহার যাওয়াই উচিত। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া যদি আবার ভুণীর অভিমান উথলিয়া উঠে। হারুনই যদি এই অনুগ্রহ লইতে অসম্মত হয়! তাহার পিতা যদি পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া আসিতে না চান। কিন্তু এ সকলের ঊর্ধ্বে সে তাহার বুদ্ধিমতী মাতার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের ও দেওয়ান সাহেবের বৈষয়িক বুদ্ধির উপর বেশি ভরসা রাখে। তাঁহারা ইহার একটা কিনারা করিয়া উঠিতে পারিবেন নিশ্চয়। কিন্তু তবু ঐ দলিতা নাগিনীর মতো তহমিনা? সে যদি ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়! হঠাৎ জাহাঙ্গিরের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। না, তাহার কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না। মাতা যাইতেছেন, যান, সে অবমানিত হইতে কিছুতেই সেখানে যাইবে না!

মাতা আসিয়া বলিলেন, 'খোকা ওঠ, রাত্রি সাড়ে আটটা বেজে গেল। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে আবার।'

সাহেবের আঙুলগুলো অতিরিক্ত ফাঁক হয়ে গেছে! যে আঙুল দিয়ে কখনো জল গলেনি, সেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে!'

দেওয়ানজি শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু এ টাকা তো জলে পড়ছে না বাবাজি! যার টাকা তাকেই দিচ্ছি। এই জমিদারিই দু'দিন পরে যার কাছে বিকিয়ে দিতে যাচ্ছি, এই দু'দশ হাজার টাকা নজরানা তো তারই কিছুই নয়। তুমি তো জমিদারি দেখলে না বাবা, এইবার যে দেখবে—তাকে এ কয় টাকার জিনিস আর দিলুম?'

জাহাঙ্গিরের মাতা আবেগভরাকণ্ঠে বলিলেন, 'তুই কি বলছিস খোকা, তোর বাবা মরবার সময় যে ঐ দেওয়ানজির হাতেই তোকে দিয়ে গেছিলেন। আজ তোর আনন্দের দিনে উনি কি হিসেব করে আনন্দ করবেন?'

পরদিন সকালে হাওড়া প্লাটফর্মে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল রাশি রাশি জিনিসপত্র একটা সেলুনের সামনে! দেওয়ানজি প্লাটফর্মে ছুটাছুটি করিয়া চেঁচাইয়া হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিলেন।

জাহাঙ্গির কলের পুতুলের মতো দেওয়ান সাহেব ও তাহার মাতার আদেশ পালন করিয়া যাইতে লাগিল। স্টেশনে হঠাৎ একজন মৌলবি সাহেব চলিয়া যাইতে যাইতে যেন জাহাঙ্গিরকে ছড়ির মৃদু আঘাত করিয়া গেল। জাহাঙ্গির ফিরিয়া দেখিবামাত্র মৌলবি সাহেব ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিলেন। কাছে যাইতেই মৌলবি সাহেব বলিলেন, 'আমি সব জানি। শিউড়িতে নেমে আমার সাথে দেখা করিস। আমিও সেখানেই নামব।'

জাহাঙ্গির হাসিয়া নমস্কার করিতে গিয়া সামলাইয়া লইয়া আদাব করিয়া চলিয়া আসিল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উনি কে খোকা?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'উনি আমাদের কলেজের আরবির প্রফেসর। উনিও শিউড়ি যাচ্ছেন, তাই আমার শিউড়িতে নেমে দেখা করতে বললেন।'

মাতা আর প্রশ্ন করিলেন না। জাহাঙ্গির তাহার প্রমত-দার এই হঠাৎ আবির্ভাবে একটু চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। সে হঠাৎ এই ভাবিয়া খুশি হইয়া উঠিল, যে সুরে স্বর্গ সে রচনা করিতে চলিয়াছে—এইবার তাহা হয়তো তাহার অদৃশ্য ভাগ্যদেবতার রুদ্র-আশীর্বাদে আগুনে পুড়িয়া যাইবে।

মাতা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'খোকা, তোর মৌলবি সাহেবকে আমাদের সেলুনেই ডেকে নে না। দেওয়ান সাহেবের কামরায় তিনি থাকবেন। যা, ডেকে এনে খেতেটেতে দে।'

জাহাঙ্গির প্রমাদ গণিল! তাহার মনে হইল মাতা বোধ হয় সন্দেহ করিয়াছেন।

সে বলিল, 'আর তো ট্রেন ছাড়বার সময় নেই মা। ওঁকে বরং বর্ধমান স্টেশনে ডেকে নেব আমাদের গাড়িতে।'

মাতা বলিলেন, 'না, না, যথেষ্ট সময় আছে! এখনো আধ ঘণ্টা দেরি। ভদ্রলোকের হয়তো কত কষ্ট হবে। তিনি তোর মাস্টার, কী মনে করবেন বলত! তাছাড়া ওঁকে দিয়ে আমার কাজ আছে।'

জাহাঙ্গির একেবারে ভয় খাইয়া গেল। পাছে মাতার সন্দেহ আরো বাড়ে, তাই সে দ্বিরুক্তি না করিয়া মৌলবি সাহেবকে খুঁজিতে নামিয়া গেল।

জাহাঙ্গির অহেতুক ভয়চিত্ত। তাহার তথাকথিত মৌলবি সাহেবকে বলিতেই তিনি সানন্দে দেওয়ান সাহেবের গাড়িতে আসিয়া বসিলেন এবং বিনা ওজরে খাদ্যাদির সৎকার করিলেন।

জাহাঙ্গিরের মাতা অত্যন্ত সুখী হইয়া বলিলেন, 'দেখ দেখি, আমি না বললে বেচারা মৌলবি মানুষ ঐ ইন্টার ক্লাসের ভিড়ে আধমরা হয়ে যেতেন।'

দেওয়ান সাহেব মৌলবি সাহেবের সাথে জাহাঙ্গিরের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গির দেখিল, তাহার প্রমত-দা নকল মৌলবি হইলেও আসল মৌলবির চেয়েও দুরন্ত-জবান। চমৎকার উর্দু-ফার্সির আমেজ দিয়া তিনি কথা বলিতেছেন।

পাশের কামরা হইতে জাহাঙ্গিরের মাতা ঝি দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, মৌলবি সাহেবকেও তাহাদের এই খুশিতে শরিক হইতে হইবে। অর্থাৎ তাহাদের সাথে তাঁহাকেও যাইতে হইবে।

মৌলবি সাহেব বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি অবশ্যই হুজুর আম্মার এ হুকুম পালন করিতেন যদি না শিউড়িতে তাঁহার রোগ-শায়িতা বহিনকে দেখিতে না যাইতেন!

মৌলবি সাহেব জাহাঙ্গিরকে এক সময় একলা পাইয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'তোমাদের সেলুনে জায়গা পেয়ে আমার ভালই হল, শালার টিকটিকি আর পিছু নিতে পারবে না!'

জাহাঙ্গির প্রশ্ন করিল, 'কিন্তু প্রমত-দা, আমার কি হবে? আমাকে যে যূপকাষ্ঠে নিয়ে যাচ্ছে!'

মৌলবি সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'খোদার মর্জি বাচ্চা! সব মেঘ কেটে যাবে। মাকে অসন্তুষ্ট করে না, খোদার রহম আপনি তোমার ওপর নাজেল হবে!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, 'সোবহান আল্লাহ মৌলবি সাহেব! ক্যা তরিকা বাতায়া আপনে!'

মৌলবি সাহেব এধার ওধার দেখিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোকে পিণাকীর মাসিমা ডেকেছেন, তাছাড়া আমারও কাজ আছে। তুই হারুনের বাড়ির ফেরতা ওখান হয়ে যাবি।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'কিন্তু মা যে সাথে আছেন!'

মৌলবি সাহেব বলিলেন, 'তার ব্যবস্থা করা যাবে'খন।'

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। জাহাঙ্গিরের বুক অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

পনেরো

বর্ধমান স্টেশনে নামিয়া জাহাঙ্গির মৌলবি সাহেবকে লইয়া 'রিফ্রেস্‌মেন্ট রুমে' ঢুকিয়া পড়িল।

সৌভাগ্যবশত তাহারা দুইজন ছাড়া আর কেহ সেখানে ছিল না।

মৌলবি সাহেব বলিলেন, 'মামারা এখনো মুসলমানকে সন্দেহের চক্ষে দেখে না, তাই আজো দিনের আলোকে কোন-রকমে মৌলবি সাহেব সেজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সে কথা যাক, তোর ওপর আবার ভীষণ কাজের ভার পড়বে, পারবি?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'এর মধ্যে তো পারা-না-পারার কথা নেই। যা আদেশ করবেন, তা আমায় পালন করতেই হবে।'

মৌলবি সাহেব খুশি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'জিতা রহো লেড়কা! তোকে আবার মালপত্র সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তুই ছাড়া এ কাজ আর কারুর দ্বারাই হবার নয়।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'সেবার কিন্তু মরতে মরতে বেঁচে গেছি দাদা। আবগারি সাব-ইন্সপেকটর যখন গাড়িতে উঠে বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে আরম্ভ করলে, তখন আমার আত্মারাম তো খাঁচা ছাড়া হবার যো হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে একজনের প্যাঁটরা থেকে সের কতক আফিম বেরোতেই সে তাকে পাকড়াও করে নেমে গেল। একে একে সব বাক্স যদি খুঁজত, কি হতো তাহলে ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে!' বলিয়াই সামলাইয়া লইল, 'ভাবনা আমার নিজের জন্য ছিল না—ভাবনা ছিল জিনিসপত্রগুলো নিয়ে। সে ব্যাটাও মরত—হয়তো বা আমিও মরতুম—মাঝে অত দামী জিনিসগুলো বেহাত হয়ে যেত!'

মৌলবি সাহেব বলিলেন, যাক এবার তোদের সেলুনেই ওগুলো নিয়ে যেতে পারবি ফিরে যাবার সময়। কারুর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

জাহাঙ্গির হঠাৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু এবার যে আমার বোধ হয় জোড়ে ফিরতে হবে দাদা!'

মৌলবি সাহেব বলিলেন, 'দেখ—নিয়তিকে এড়াতে পারবিনে। আমাদের বজ্রপাণিও তো বিবাহিত। শুধু বিবাহিতই নন, ছেলে-পিলে ঘর-সংসার আছে। আসল কথা, তোর যদি সত্যকার দেশপ্রেম থাকে—কোন ব্যাটাই তোর সামনে দাঁড়াতে পারবে না।'

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িতেই তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উঠিতেই দরজার সামনে এক চির-পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া জাহাঙ্গির থতমত খাইয়া গেল। এ যে সেই ধাড়ি টিকটিকি অক্ষয়বাবু! জাহাঙ্গিরের অবস্থা বুঝিয়াই মৌলবি সাহেব কাংস্যকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'আরে বেহোঁশ! আভি টারিন ছোড় দেগা! দৌড়কে চল!'

অক্ষয়বাবু বাজপাখির মতো চোখে তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন।

জাহাঙ্গিরকে দেখিয়া অক্ষয়বাবুও পাশের গাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

জাহাঙ্গির ইঙ্গিত করিতেই মৌলবি সাহেব বলিয়া উঠিলেন, 'কুছ ফিকির নেই বাচ্চা, উয়ো হজম হো জায়েগা।'

দেওয়ান সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'আর একটু দেরি হলেই স্টেশনে বসে বসে হজম করতে হত মৌলবি সাহেব। আর আপনারা নামবেন না কোথাও! গাড়িতেই খাবার আনিয়ে নেবেন।'

আন্ডাল টেশনে গাড়ি বদল করিবার সময় জাহাঙ্গির দেখিল, অক্ষয়বাবু তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। সেদিকে আর বেশি দৃষ্টিপাত না করিয়া একটা বই লইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের গাড়ি হইতে নামিবার ঝনঝাট পোহাইতে হইল না। তাহাদের সেলুন ইঞ্জিন আসিয়া টানিয়া শিউড়ির গাড়ির ন্যাজে জুড়িয়া দিল।

মৌলবি সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না, গানটা জান?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'গানটা জানি, কিন্তু গাইতে জানি না। আর জানলেও গাইতাম না।'

পাশের কামরা হইতে মা বলিয়া উঠিলেন, 'খোকা বুঝি গান-টান একেবারে ভুলে গেছিস?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'হাঁ, মা, ওসব ভুলে যাওয়াই ভালো। অনর্থক কতকগুলো লোকের শান্তিভঙ্গ করে লাভ কি?'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'গানে বুঝি শান্তিভঙ্গ হয়? তুই একেবারে ভূত হয়ে গেছিস খোকা! দুনিয়ায় কি তোর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটে গেছে এরি মধ্যে?'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'গানে বুঝি শান্তিভঙ্গ হয়? তুই একেবারে ভূত হয়ে গেছিস খোকা! দুনিয়ায় কি তোর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটে গেছে এরি মধ্যে?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'মা ভয়ানক চালাক! পাশের জানলায় বসে শুনছেন আমরা কি কথা বলা-কওয়া করি!'

সন্ধ্যায় ট্রেন শিউড়ি আসিয়া পঁহুছিল।

হারুন ছুটিয়া আসিয়া জাহাঙ্গিরের মাতার ও দেওয়ান সাহেবের পায়ের ধূলা লইল।

মাতা তাহাকে জাহাঙ্গিরের মতোই বুকে ধরিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন।

দেওয়ান সাহেব এক ডজন কুলি লইয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন।

হঠাৎ মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খোকা, তোর মৌলবি সাহেব কোথায় গেলেন?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'উনি এতক্ষণ বোধ হয় তাঁর বোনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন মা!'

মাতা বলিলেন, 'সে কি! তুই ওর বোনের বাসা চিনিস? সেখান থেকে তাঁকে যে আনতেই হবে!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'সে তো আমি চিনি না মা। তাছাড়া ওঁর বোনের অসুখ, এখন তো যেতেও পারতেন না।'

হারুন জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন মৌলবি সাহেব?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'প্রফেসর আজেহার সাহেব।'

হারুন বলিল, 'কই তাঁকে তো দেখলুম না।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'তোমরা যতক্ষণ বোঁচকা-পুঁটুলি সামলাচ্ছিলে, ততক্ষণ উনি পগার পার হয়ে গেছেন।'

জাহাঙ্গির দেখিল, অক্ষয়বাবু সারা প্লাটফর্ম মন্থর করিয়া ফিরিতেছেন। সে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া মনে মনে বলিল, 'ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।'

তবু তাহার মনে কেমন একটা অজানা ভয় উঁকি দিয়া ফিরিতে লাগিল।

গোটা চার পালকি ও দুইখানা গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া জিনিসপত্র সমেত সদলবলে জাহাঙ্গির হারুনের গ্রামে যাত্রা করিল।

টর্চলাইট ও বন্দুক সাথে ছিল। তাহা ছাড়াও চারি পালকির বেহারা, গাড়োয়ান, ভোজপুরি, বরকন্দাজ প্রভৃতির জন্য কেহ আর রাত্রে যাইতে আপত্তি করিল না। আকাশও বেশ পরিষ্কার ছিল, ঝড়-বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ছিল না। নিদাঘের সুনির্মল আকাশে শুক্লা নবমীর চাঁদ ঝলমল করিতেছিল।

পালকিতে উঠিয়া জাহাঙ্গিরের মাতা বলিলেন, 'বাবা! এ রকম বাক্সবন্দি হয়ে যাওয়া তো অভ্যাস নেই। একে এই গরম, তার ওপর এই রকম ঘাড়মুড় ভেঙে বসে থাকা। আমি তাই বলছিলাম মোটরটা সাথে আনতে।'

হারুন হাসিয়া বলিল, 'মোটর না এনে ভালই করেছেন মা। এদেশে মোটর যাবার রাস্তা নেই। তার ওপর মাঝে নদী।'

বিচিত্র শব্দ করিতে করিতে পালকি-বাহকগণ অগ্রে অগ্রে চলিল। পশ্চাতে গরুর গাড়ি, সকলের শেষে বন্দুক-স্কন্ধে বরকন্দাজ।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় সকলে হারুনদের গ্রামে গিয়া পঁহুছিলেন। পল্লিগ্রামে রাত্রি এগারটার সময় কেহ সজাগ ছিল না। বেগম দেখিতে হয়তো গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। হারুন তাহার পিতা ও বোনদের ছাড়া কাহাকেও এ খবর বলে নাই, কাজেই গ্রামেও এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে পারে নাই। মোবারক তাহার এক বন্ধুকে এই খবর বলায় সে বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল; উপরন্তু তাহার মাথায় জোর চাঁটি মারিয়া বলিয়াছিল যে, তাহারও পাগল হইবার আর দেরি নাই। ইহার পর সে আর কাহাকেও এ খোশখবর দিতে সাহস করে নাই।

এত পালকি এত লোকজন দেখিয়া মোবারক ভ্যাবাচাকা খাইয়া প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল, তাহার আক্কেল গুড়ুম হইয়া গিয়াছে। তাহার অন্ধ পিতা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে গিয়া দুইবার আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। হারুন তাহার পিতাকে স্থির হইতে বলিয়া জাহাঙ্গিরের মাতাকে সসম্মানে বাড়ির ভিতর লইয়া গেল। দেওয়ান সাহেব বাহির বাড়িতে গিয়া বসিলেন।

জাহাঙ্গির সামনের খোলা মাঠে বসিয়া হাওয়া খাইয়া বাঁচিল।

তহমিনা ও মোমি আসিয়া জাহাঙ্গিরের মাতার কদমবুচি করিল। মাতা দুই বোনকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ললাট চুম্বন করিলেন।

দাসীদের হাতে লণ্ঠন ছিল, তাহারি আলোকে মাতা অনিমেষ নেত্রে তাঁহার ভাবি বধূর মুখ দেখিতে লাগিলেন। হ্যাঁ, তাহার পুত্রবধূ হইবার মতো রূপসী বটে!

মাতা বারেবারে তহমিনার ললাট চিবুক ও মাথায় চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যধিক আদরে, কিম্বা কেন জানি না, তহমিনা তাঁহার বুকে মুখ রাকিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মা আঙিনাতেই দাঁড়াইয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, 'কেঁদো না মা আমার, সোনা আমার! আর ভয় কি! ও পাগল তোমার অসম্মান করেছে—আমি তোমাকে বুকে তুলে নিতে এসেছি।'

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া তহমিনা শান্ত হইল। ভাগ্যক্রমে তাহার উন্মাদিনী মাতা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন, নৈলে তিনি হয়তো তাঁহার মীনার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিতেন।

বাড়ির অবস্থা দেখিয়া জাহাঙ্গিরের মাতার বুঝিতে বাকি রহিল না—দুরবস্থার শেষতম স্তরে ইহারা আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। এমন সোনার চাঁদ মেয়েও এমন ঘরে থাকে।

তহমিনা সকলের জন্য রাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সকলে তাহা খাইয়া তাহার রান্নার অশেষ তারিফ করিতে লাগিলেন।

হারুনের পিতা কেবলি বলিতে লাগিলেন, এ গরিবের বাড়ি হাতির পা পড়িবে—ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাহাদিগকে বসিতে দিবার মতো তাঁহার স্থান তো নাই। তাঁহার বিনয় ও অসোয়াস্তি দেখিয়া দেওয়ান সাহেব এবং বেগম সাহেবা ঘনিষ্ঠ আলাপ-আপ্যায়নে তাঁহাকে আপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হারুনের পিতা আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

জাহাঙ্গিরের মাতা নিজে তহমিনা, মোমি ও মোবারককে খাওয়াইলেন। অত্যধিক গরম পড়ায় তাঁহার সাথের দুইখানা ক্যাম্পখাট খুলিয়া উঠানেই শুইয়া পড়িলেন। তহমিনাকে পাশের খাটে শোয়াইয়া আদর করিতে করিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাহার মনের কথা বাহির করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তহমিনা জীবনে এত স্নেহ পায় নাই। সে এই আদরে গলিয়া গিয়া ছোট খুকিটির মতো তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া দুই একটি কথায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।

দেওয়ান সাহেব হারুনের পিতার মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে রাত্রে আর বেশি কথা হইল না। পরিশ্রান্তিতে সকলেই শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

তহমিনার চক্ষে ঘুম ছিল না। সে যখন দেখিল, সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, অথচ তাহার ঘুম আসিতেছে না, তখন সে উঠিয়া উন্মাদিনী মাতার খোঁজ লইতে গেল। উঠান হইতে অন্দরে যাইবার পথেই সদর দরজা। সে দেখিল, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে।

দরজা বন্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ তাহার সামনে মাঠের উপর দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, অস্তমান চন্দ্রের ম্লান চন্দ্রালোকে বসিয়া জাহাঙ্গির আকাশের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। সে আর চোখ ফিরাইতে পারিল না, নির্নিমেষ নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

কেন সে অতন্দ্রনয়নে একা জাগিয়া শূন্য আকাশে চাহিয়া আছে? এই সুন্দর পৃথিবীতে কি তাহার চাহিবার কিছুই নাই। এত ঐশ্বর্য, এমন মা যাহার তাহার কেন এই দুঃখ-বিলাস?

তহমিনা বুঝিতে পারিয়াছিল, কেন হঠাৎ জাহাঙ্গিরের মাতা সদলবলে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাহার আরো মনে হইতে লাগিল, হয়তো জাহাঙ্গিরই তাহার মাতাকে লইয়া আসিয়াছে। ভাবিতেই তাহার মন অপূর্ব আনন্দে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিল। তাহা হইলে, যতটা হৃদয়হীন সে জাহাঙ্গিরকে মনে করিয়াছিল, ততটা সে নয়!

কিন্তু কি রকম বদরসিক লোকটা? একবারও কি ভুলিয়া খোলা দরজার দিকে তাকাইতে নাই?

সে যেন দরজা বন্ধ করিবার জন্যই দুই কবাটে আঘাত করিল এবং যুগল কবাটের স্বল্প অবকাশ দিয়া দেখিতে লাগিল, জাহাঙ্গিরের ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে কিনা।

জাহাঙ্গির দরজার দিকে তাকাইল এবং একজন দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারিল। সে মনে করিল, কোনো প্রয়োজনে হয়তো তাহার মাতা তাহাকে ডাকিতেছেন। সে দরজা ঠেলিতেই তহমিনাকে দেখিয়া চমকাইয়া প্রশ্ন করিল, 'কে? ভুণী? আমাকে ডাকছিলে?'

ভুণী অর্থাৎ তহমিনা লজ্জায় মরিয়া গিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, ছি, ছি, একি বেহায়াপনা সে করিল!

জাহাঙ্গির আবার প্রশ্ন করিল, 'আমাকে কি কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবে?'

ভুণী হঠাৎ যেন কূল পাইল। সে অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরে সহজ হইবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল, 'আবার এলেন কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি?'

জাহাঙ্গির আহত হইয়া তাহার চোখে চোখ রাখিয়া বলিল, 'আমি তো আসিনি, মা এসেছেন তোমায় নিয়ে যেতে!'

তহমিনা জিজ্ঞাসা করিল, 'মা তাহলে সব শুনেছেন?'

জাহাঙ্গির ম্লান হাসিয়া বলিল, 'শুনেছেন নয়—জেনেছেন তোমার চিঠি পড়ে!'

তহমিনা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'মাগো, কি হবে! ছি ছি! তুমি চিঠি দেখালে কেন?'

জাহাঙ্গির এইবার একটু জোরেই হাসিয়া ফেলিল।

তহমিনা উত্তেজনায় জাহাঙ্গিরের মুখের কাছে হাত আনিয়া সহসা থামিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'দোহাই! অত জোরে হেসো না, কেউ জেগে উঠবে!'

জাহাঙ্গিরের মনে নেশা ধরিয়াছিল। সে আয়তচক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি যাবে তো?'

তহমিনা লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, 'সে তো আপনিই জানেন!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'বাঃ রে! বেশ তো! একবার 'আপনি, একবার 'তুমি' একবার 'হিঁয়া আও—একবার 'ভাগ্যে'।'

জাহাঙ্গিরের মাতা পাশ ফিরিয়া শুইতেই তহমিনা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই অসাবধানে তাহার হাতের একটা আঙুল দুই দরজার মাঝখানে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া গেল। সে ক্ষণিক আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল।

জাহাঙ্গির তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া প্রশ্ন করিল, 'কি হল ভুণী? কিছুতে কামড়েছে?'

ভুণী স্পর্শকণ্টকিত হইয়া মনে মনে বলিল, কামড়েছে বিষধর সাপে! বাহিরে বলিল, 'আঙুলটা দরজায় বড্ডো চিপে গেছে!'

জাহাঙ্গির ক্ষীণ চন্দ্রালোকেও দেখিতে পাইল, সত্য সত্যই আঙুলটা নীল হইয়া উঠিয়াছে।

সে ভুণীর হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

তহমিনা পুলকে আবেশে জাহাঙ্গিরের কোলে ঢলিয়া পড়িল। জাহাঙ্গির আজ দিশা হারাইল। সুতীব্র আবেশে সে তহমিনাকে চুম্বন করিল।

তহমিনা সুখে লজ্জায় উত্তেজনায় শিথিল-তনু শিথিল-বসনা হইয়া পড়িল। সে কিছুতেই যেন নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। মনে হইল তাহার নড়িবার শক্তিটুকু পর্যন্ত কে হরণ করিয়া লইয়াছে! সে শুধু তাহার দুই বাহু দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে জাহাঙ্গিরের কণ্ঠ জড়াইয়া দুই একবার অস্ফুট মিনতি করিল!

দেব-কুমার এক মুহূর্তে রক্ত-লোলুপ পশু হইয়া উঠিল।

কোথা হইতে যেন কি ঘটিয়া গেল। তহমিনা কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি এ কি করলে?'

জাহাঙ্গির কোন উত্তর না দিয়া মাতালের মতো টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।

এ কি করিল সে? পঙ্কজ হইলেই নিজেকে পঙ্কের ঊর্ধ্বে শতদলের মতো তুলিয়া ধরিবার তপস্যা সে করিতেছিল। তাহার যে স্বদেশ-মন্ত্রের পবিত্র অগ্নিতে অগ্নিশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে! স্বর্গে আরোহণ করিতে করিতে এ কোন রসাতলে সে পতিত হইল! অনুতাপে অনুশোচনায় তাহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল। কিন্তু একি! এক মুহূর্তে সে যেন অতি বড় কাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে! তাহার এখন মৃত্যুকে ভয় হইতেছে! আর সে অসঙ্কোচে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে পারে না! সে তো তহমিনার সর্বনাশ করে নাই, সর্বনাশ করিয়াছে সে নিজের।

জাহাঙ্গির মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া অসহায় শিশুর মতো রোদন করিতে লাগিল।

হঠাৎ কাহার শীতল স্পর্শে সে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে শুনিয়াছিল, এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সাপের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।

সে মনে করিল স্বয়ং বিধাতা বুঝি তাঁহার দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার অঙ্গ বহিয়া সাপ চলিয়া গেল।

তবে কি মৃত্যুও তাহাকে ঘৃণা করে? ক্লান্ত হইয়া সে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ষোল

সকালে উঠিয়া ভুণীর মনে হইল, তাহার সকল দর্পের অবসান হইয়াছে। আজ সে পথের ভিখারিণী। দুই হাত পাতিয়া এখন তাহাকে ভিক্ষার তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিতে হইবে। কখনও সে মনে করিয়াছিল, যত বড় দরিদ্র হোক তাহারা, তবু সে দেখাইয়া দিবে—আত্মসম্মান শুধু ধনীরই একচেটিয়া নয়। দারিদ্র্যের কঠিন দর্প দিয়াই সে ধনীর ঐশ্বর্যকে অতি বড় আঘাত করিবে।

আজ কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, আঘাত তো সে আর করিতেই পারিবে না, উল্টো যত আঘাতই আসুক—তাহাকে পড়িয়া পড়িয়া তাহা সহিয়া যাইতে হইবে।

হারুন ফিরদৌস বেগম সাহেবার তার পাইয়া তাহার বাবাকে জানাইবামাত্র—তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন, 'বাবা, এতদিনে খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন!' ভুণীর মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'রাজরানী হয়ে আমাদের ভুলে যাসনে মা!'

ভুণী কিন্তু কঠোর কণ্ঠে বলিয়াছিল, 'তাঁরা নিতে এলেও আমি তোমায় ছেড়ে যাব না তো বাবা!'

পিতা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, 'সে কি মা! হাতের লক্ষ্মীকে কি পায়ে ঠেলতে হয়? অতবড় জমিদারির বেগম নিজে আমায় বাড়ি আসছেন—একি আমার কম সৌভাগ্য?'

ভুণী রাগ করিয়া বলিয়াছিল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ বাবা, আমার বাপ-দাদার আজ অর্থ না থাকলেও বংশ-গৌরবে তাঁরা তাঁদের চেয়ে অনেক বড়। বাড়ি বয়ে তাঁরা তাঁদের ঐশ্বর্যের দর্প দেখাতে আসবেন, এ তোমরা সইলেও আমি সইতে পারব না।'

জাহাঙ্গিরের মাতার প্রাণ-ঢালা স্নেহ-আদরে তাহার কঠিন অভিমানের আবরণ টুটিয়া পড়িয়াছিল, তবু সে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের কথা ভাবিতেই পারে নাই।

কিন্তু কি করিতে কি হইয়া গেল! কেন সে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মোমি ব্যতীত তখনো কেহ জাগিয়া উঠে নাই। তহমিনা উঠিতে গিয়াও যেন উঠিতে পারিল না! শুইয়া শুইয়াই দেখিল, জাহাঙ্গিরের মাতা তাহাদের ঘরের দাওয়ায় মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কোরান 'তেলওত' করিতেছেন।

অপূর্ব ভক্তি-মধুর সে কণ্ঠস্বর। তাহার একবর্ণও সে বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু কেমন এক অজানা শ্রদ্ধায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। তাহার মনের অর্ধেক গ্লানি যেন কাটিয়া গেল।

সে চেষ্টা করিয়া উঠিয়া পড়িল।

জাহাঙ্গিরের মাতা কোরান তুলিয়া রাখিয়া বলিলেন, 'উঠেছ মা সোনা? এ কি? তোমার চোখ-মুখ অমন হয়ে গেছে কেন মা? অসুখ করেছে বুঝি?'

তহমিনার মনে হইল, তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় মাতা সব বুঝিতে পারিয়াছেন। সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিল, 'জি, না।'

জাহাঙ্গিরের মাতা তাহাকে বক্ষে টানিয়া ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'বালাই। এমন বদ-খেয়ালি কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় মা!—তোমার মা কখন উঠবেন! তাঁহাকে যে দেখলুমই না।'

তহমিনার কিছু বলিবার আগেই মোমি বলিয়া উঠিল, 'মা উঠলেই তো কাঁদতে শুরু করবে বড় ভাইয়ের নাম করে!'

জাহাঙ্গিরের মাতা সব শুনিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। মোমিকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমার মা ভালো হয়ে যাবেন মা। মা আমরা তোমার মাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাব। আর, যদ্দিন তোমার মা ভালো হয়ে না উঠেন, তদ্দিন আমি হব তোমার মা, কেমন?'

কলিকাতা যাওয়ার কথায় মোমি অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল। সে কলিকাতা সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতে লাগিল। জাহাঙ্গিরের মাতা হাসিয়া সে সবের উত্তর দিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে জাগিয়া উঠিল। গ্রামে বেগম আসিয়াছে বলিয়া হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। ঘরে মেয়েদের ভিড় লাগিয়া গেল।

জাহাঙ্গিরের মাতা বা দেওয়ান সাহেব বিবাহের কোন কথাই তুলিলেন না।

জাহাঙ্গিরের মাতা হারুনের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি! অবশ্য ছেলের বন্ধুর বাড়ি দেখতে আসাও আমাদের এখানে আসার আর একটা কারণ। আমি পশ্চিমবঙ্গের পল্লিগ্রাম কখনো দেখিনি—এই অবসরে তাও দেখা হয়ে গেল।'

হারুনের পিতা বিনয়-কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, 'আপনাদের মতো লোক যে গরিবের বাড়ি এসেছেন, এই আমার পরম সৌভাগ্য। জাহাঙ্গির বাবাজি না এলে তো আপনার পদার্পণ হত না এ অজ-পাড়াগাঁয়ে।—আর আপনাকে ভিক্ষা দেওয়ার মতো কোনো কিছুই নেই আমার।'

জাহাঙ্গিরের মাতা বলিলেন, 'আপনার যে সন্তান-রত্ন আছে—তারাই যে সাত রাজার ধন। আমি হারুনকে ভিক্ষা চাচ্ছি। সে আমার নতুন জমিদারি স্টেটের ম্যানেজার হবে। আপাতত সে মাসে তিনশো টাকা করে পাবে। আমার একটিমাত্র ছেলে, কিন্তু সে কিছু নেয়ও না, দেখেও না। সে এরি মধ্যে আধা-দরবেশ হয়ে গেছে। হারুন কিন্তু আমার ছেলের মতোই থাকবে—আর তার সাথে সাথে আপনাদেরও কলকাতা যেতে হবে। হারুনের কাছেই আপনারা থাকবেন। হয়তো চিকিৎসা হলে ওর মাও ভালো হয়ে উঠতে পারে।'

হারুনের পিতা বহুক্ষণ কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। তবে কি ভুলীকে পুত্রবধূ করিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহার এই জমিদারি চাল? ইহা কি তাহারি ক্ষতিপূরণ? তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলিলেন, 'আপনার দয়ার জন্য আপনায় অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি বেগম সাহেব, কিন্তু হারুনের তিন শ টাকা মাইনে পাবার মতো তো গুণ বা কর্মক্ষমতা নাই। আপনিও আমার ছেলের বন্ধুর জননী, কাজেই আত্মীয়াও বললেই হয়। আমাদের খুবই অভাব, তবু মাফ করবেন—আপনার কাছ থেকে এ দান নিতে আমার হাত উঠবে না।'

দেওয়ান সাহেব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বেগম সাহেবকে আত্মীয়ার মতোই বকছেন কেন খোন্দকার সাহেব, উনি তো আপনার বড় আত্মীয়া হতে চলেছেন—দুদিন পরে বেয়ান হবেন—ওঁকে যদি এমন করে ফিরিয়ে দেন, আমরা সকলে বড় ব্যথা পাব। এখানে আজ সকালে গ্রামের লোকের মুখে শুনেছি আপনাদের বাড়িতে কোনো ভিখারী সোনা-রূপা না পেয়ে ফিরে যেত না। আমরাই কি তা হলে শুধু-হাতে ফিরে যাব?'

হারুনের পিতা এইবার গলিয়া গিয়া বেদনাক্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'সেদিন তো আমাদের নাই দেওয়ান সাহেব! এখন এক মুঠো চাউল দিতে পারিনে ভিখারীকে। আমার ওয়ালেদ সাহেব পর্যন্ত সত্যই আমাদের বাড়ির এই রেওয়াজ ছিল। আমিও তা দেখিছি মাত্র, কিন্তু এ কমবখ্‌ত বাপ-দাদার সে ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে পারেনি!'

জাহাঙ্গিরের মাতা বলিয়া উঠিলেন, 'হারুন আর তহমিনাই তো আপনার সোনার চেয়েও অমূল্য রত্ন—আমি ঐ সোনাই তো চাচ্ছি!'

হারুনের পিতা বিচলিত হইয়া উঠিলেন, 'আর আমায় লজ্জা দেবেন না, দোহাই! গোস্তাখির যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছেন। আমি আপনাদের যে ধরনের ধনী মনে করেছিলুম—আপনারা তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাইরের ঐশ্বর্য আপনাদের অন্তরের ঐশ্বর্যকে দেখছি এতটুকু মলিন করতে পারেনি।—ভিক্ষা বলবেন না, ওরা আজ থেকে আপনারই সন্তান হল! আমি তো থেকেও নেই। আমি অন্ধ হয়ে ওদের কোন-কিছুই দেখতে পারিনে। বাপ অন্ধ, মা পাগল। ওদের তো বাপ-মা থেকেও নেই। এখন থেকে আপনারাই ওদের বাপ মা হলেন। এখন আমি শান্তিতে মরতে পারব।' বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ ভাঙিয়া আসিল, আর বলিতে পারিলেন না।

দেওয়ান সাহেব বলিলেন, 'শুধু ওদের তো নিতে আসিনি, আপনাদের সকলকেই যে নিতে এসেছি। আপনার পৈতৃক ভিটে চিরদিনের জন্য ছেড়ে যেতে বলছিনে, কিছুদিন কলকাতা থেকে আপনাদের দুইজনারই চিকিৎসাপত্র করান—খোদা যদি ভালো করে তোলেন আপনাদের আবার ফিরে আসবেন এই বাড়িতে!'

হারুনের পিতা আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, ভুণীর শাদি কি তা হলে কলকাতাতেই সম্পন্ন করতে চান? কিন্তু, তা তো হতে পারে না সাহেব।'

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, বিবাহ গ্রামেই হইবে! কিন্তু কিছুদিনের জন্য সেটা স্থগিত রহিল। হারুন ইতিমধ্যে তাহার এই পুরাতন বাড়ির সংস্কার করিবে। কথা হইল, এখন গ্রামের কাহাকেও বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে না। হারুন জমিদারি স্টেটে চাকুরি লইয়া সপরিবারে কিছুদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে—ইহাই সকলকে জানান হইবে। ইহাও স্থির হইল, আর তিন দিনের মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া যাত্রা করিতে হইবে।

হারুনের পিতা ভয় করিয়াছিলেন, ইহাতে হয়তো একমাত্র ভুণীরই আপত্তি হইবে। কারণ, কাল পর্যন্ত সে নাগিনীর মতো ফণা ধরিয়াছে। কিন্তু ভুণীকে সব কথা বলার পর সে যখন এতটুকুও আপত্তি উত্থাপন করিল না—তখন পিতা বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ সন্ধান করিতে গিয়া মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন, 'বেটির আমার বর চোখে ধরেছে কিনা, তাই আর কথাটি কইতে পারলে না!'

হারুনের মাতা কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া হৈ-চৈ করিয়া তুলিলেন। এইসব অজানা লোকজন দেখিয়া কখনো তিনি হাসিতে, কখনো বা তারস্বরে মিনাকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মায়ের ডাকে জাহাঙ্গির ভিতরে আসিতেই উন্মাদিনী 'ঐ আমার মিনা এসেছে—আয়, আয়, সাইকেল দেবো' বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। মাতার আদেশে জাহাঙ্গির সেইখানে অপরাধীর মতো বসিয়া রহিল।

সে আর চোখ তুলিয়া কাহারও পানে চাহিতে পারিল না। সব চেয়ে মুশকিল হইল ভুণীর, সে বাহির হইতে পারে না, অথচ বাহির না হইলেও নয়।

লজ্জার মাথা খাইয়া ভুণীকে দুই-একবার বাহিরে আসিতে হইল। সে না আসিলে চলিবেই বা কি করিয়া? এত লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তো তাহাকেই করিতে হইবে!

জাহাঙ্গিরের মাতা হারুনের মাতাকে অনেক বুঝাইয়া জাহাঙ্গিরকে বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া তহমিনাকে লইয়া পড়িলেন। রান্নার সমস্ত ব্যাপার তাঁহার বাঁদিদের হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি ভুণীকে স্নান করাইয়া যখন অপরূপ বসন-ভূষণে সাজাইয়া তুলিলেন, তখন গ্রামের মেয়েরাই বলিল, ভুণীর যে এত রূপ—তাহা তাহারাও জানিত না। অলঙ্কার ও কাপড়-চোপড়ের বাহার দেখিয়া সকলেই বলিল, মেয়ে বরাত লইয়া আসিয়াছিল বটে। কেহ কেহ ইহাও বলিল যে, এত গহনা-কাপড় দিয়া সাজাইলে তাহার মেয়েকেও ইহার চেয়ে কম সুন্দর দেখাইত না।

মোমি ও মোবারক তাহাদের অদৃষ্টপূর্ব বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। গ্রামের সমস্ত বাড়িতে সন্দেশ মিঠাই পরিবেশন করা হইল। সকলে এই সন্দেশ দেওয়ার অর্থ অন্যরূপ করিল। সন্দেশের মূলে যে ভুণী, ইহা লুকাইলেও কাহারও আর বুঝিতে বাকি রহিল না।

দুই দিনেই দেওয়ান সাহেব ও জাহাঙ্গিরের মাতা গ্রামের প্রায় সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন তাঁহাদের সহজ সরল নিরহঙ্কার ব্যবহারে।

গ্রামের আত্মীয়-স্বজনের নিকট অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় লইয়া হারুনেরা তাহাদের পৈতৃক ভিটার মায়া কাটাইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।

হারুনের নিকট-আত্মীয় একজন তাহাদের বাড়ি দেখাশুনা করিবেন, কথা থাকিল। ইতিমধ্যে হারুন আসিয়া নতুন করিয়া বাড়ি তৈরি করিয়া যাইবার পর তাহার পিতা-মাতা ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া আত্মীয়-স্বজনকে আশ্বাস দিল।...

হারুনের মাতা জাহাঙ্গিরকে দেখা অবধি আর বেশি কান্নাকাটি করেন নাই। তাঁহাকে বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহার মীনা বড় হইয়া বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। উন্মাদিনী তাহাই বিশ্বাস করিয়াছে। কাজেই তাঁহাকে লইয়া যাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

সতেরো

স্টেশনে পঁহুছিয়াই জাহাঙ্গির দেখিল, সারা গায়ে ভস্ম-বিভূতি মাখা জটাজুটধারী এক পৌণে-ষোল-আনা নাগা সন্ন্যাসী তাহার চিমটার ইঙ্গিতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল।

জাহাঙ্গির দেখিল সন্ন্যাসী ইঙ্গিত করিয়াই রেল-লাইনের অপর পারে এক বৃক্ষনিম্নে গিয়া বসিলেন। সেখানে আরো বহু সন্ন্যাসী—কেহ ধুনি জ্বালাইয়া, কেহ ধ্যান করিতেছে, কেহ গাঁজা টানিতেছে, কেহ ভজন গান করিতেছে।

জাহাঙ্গির কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিল। জিনিসপত্র নামানোর হ্যাঙ্গামে কেহ অত লক্ষ করিল না।

সন্ন্যাসী-দল হইতে কিছু দূরে একটু নিরালায় গিয়া সেই সন্ন্যাসী বলিল, 'তুমি আমাকে চেননা। অবশ্য, আমি তোমায় চিনি। আমাদের অত্যন্ত বিপদ। আজ ভোরে তোমার প্রমত-দা ও পিণাকীর মাসীমা অস্ত্রশস্ত্র সমেত ধরা পড়েছেন। তোমার গাড়িতে তুলে দেবেন বলে তাঁরা গরুর গাড়িতে করে সে সব আনছিলেন, রাস্তায় পুলিশ পাকড়েছে। এ খবর পুলিশ বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি, অন্যান্য সকলকে ধর-পাকড়ের জন্য। মাসীমাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রমত্তকে ধরা দিতে হয়েছে—আমরা সকলে পালিয়ে এসেছি। পুলিশদের দুজন মারা গেছে আমাদের গুলিতে—তোমার উপর বজ্রপাতের

আদেশ, মাসীমার মেয়ে চম্পাকে নিয়ে কলকাতায় আপাতত তোমাদের বাসায় রাখবে। তারপর দু'এক দিনের মধ্যে বন্ধুপাণি লোক পাঠিয়ে তাকে নিয়ে যাবেন। চম্পাকে বোরকা পরিয়ে মুসলমান মেয়ে সাজিয়ে রেখেছি। সে একটু পরেই স্টেশনে আসবে—তুমি তাকে তোমাদের গাড়িতে তুলে নিও। খুব সাবধানে কিন্তু, পুলিশ ভয়ানক কড়া পাহারা দিচ্ছে প্লাটফর্মে। প্লাটফর্মে চম্পার সাথে এক বাক্স মালপত্র আছে। সাবধান! প্রাণ দিতে হয় দিও, তবু সে সব যেন বে-হাত না হয়। যাও!'—বলিয়াই সন্ন্যাসী সেখানে বসিয়া গাঁজার কলিকায় দম দিতে দিতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'বোম্ কালী কাল্‌কাত্তাওয়ালি।'...

জাহাঙ্গির চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কিন্তু ভয় পাইলে চলিবে না, ভাবিবারও অবকাশ নাই। তাহাকে প্রাণ দিয়া কর্তব্য পালন করিতে হইবে। সে স্টেশনে আসিয়া দেখিল, জিনিসপত্র সেলুনে উঠানো হইতেছে। গাড়ি আসিবার তখনো অনেক দেরি।

তাহার মাতা ভুণী মোমি প্রভৃতিসহ সেলুনে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সেলুনটা প্লাটফর্ম হইতে কিছু দূরে ছিল। সে দেখিল, আর একখানা পালকি তাহাদের দিকে আসিতেছে। সে তাহার মাতাকে বলিল, 'মা, বলতে ভুলে গেছি, আমাদের মৌলবির ভাগ্নী আমাদের সাথে যাবে—দু' একদিন আমাদের বাড়িতে সে থাকবেও। ডায়োসেশান-এ সে পড়ে। মৌলবি সাহেব বিশেষ কাজে আজ যেতে পারলেন না, উনি দু'এক দিনের মধ্যেই কলকাতা এসে পৌঁছবেন।'

বলিতে বলিতে পালকি আসিয়া সেলুনের নিকট থামিল এবং একটি বোরকাপরা তরুণী উঠিয়া আসিল। আসিয়াই সে মুসলমানি কায়দায় জাহাঙ্গিরের মার পদধূলি লইল। ঝি তাহার বাক্স-প্যাঁটরা সেলুনে তুলিয়া লইল। মাতা আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'এবার বোরকাটা খুলে ফেল মা, যা গরম সেদ্ধ হয়ে গেছ বুঝি।'

চম্পা সামনের খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়া বোরকা খুলিয়া ফেলিল। তাহার রূপে সকলের চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল। ভুণীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। সত্য সত্যই চম্পার কাছে তাহার রূপ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল।

ঝি বলিয়া উঠিল, 'বিবিসাব, আপনার বাসকে কি রাখছেন ক'নত। পাতর রাখছেন না তো? মাইয়ো মা, যা ভারী।'

চম্পা হাসিয়া বলিল, 'বই-পত্তর আছে কিনা, তাই অত ভারী।' মা মুগ্ধনেত্রে তাহাকে দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, এ রূপ নয়, রূপের শিখা। রূপের চেয়ে তেজ-দীপ্ত আরো বেশি। চক্ষুতে অদ্ভুত জ্যোতি, তাকানো যায় না।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নামটা কি মা?' চম্পা কিছু বলিবার আগেই জাহাঙ্গির বলিল, 'ওর নাম আমিনা।'

মাতা বলিলেন, 'এঁর কথা ত তুই কখনো বলিসনি খোকা!'

জাহাঙ্গির বলিল, 'ওঁর কথা ত আমি আগে জানতুম না মা। আমি স্টেশনে আসতেই মৌলবি সাহেব ওঁকে সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আমাদের সাথে নিয়ে যাবার জন্য

দিয়ে গেলেন। মৌলবি সাহেব আমাদের সাথে সেদিন যেতে পারেননি বলে লজ্জায় আর তোমার সঙ্গে দেখা করলেন না। তাছাড়া ওঁর কাজও ছিল।'

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার মার অসুখ করেছিল শুনেছিলুম, এখন তিনি ভালো আছেন ত?'

চম্পা উত্তর দিল, 'জি হাঁ। মা চেঞ্জে যাবেন কাল, তাই আমি কলকাতা চলে যাচ্ছি। আমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে তাঁর সাথে গেলুম না। কয়দিন আপনাদের তকলিফ দেবো।'

মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ছি মা, ওকথা বলতে নেই। ও তোমার নিজের বাড়িই মনে করবে। হাঁ দেখ, তোমার সাথে মা পরিচয় করে দিতে ভুলে গেছি, এই হচ্ছে তহমিনা—আমার হবু—বৌমা। এ হচ্ছে ওর ছোট বোন মোমি, ইনি হচ্ছেন ওর মা—শরীর খারাপ তাই ঘুমোচ্ছেন।

চম্পা ভুণীর পাশে আসিয়া বসিল, কিন্তু তাহার মুখ যেন কেমন ম্লান হইয়া গেল। ভুণীর তাহা চক্ষু এড়াইল না। চম্পা ভুণীর সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুইজনে কেহই যেন সহজ হইতে পারিল না।

জাহাঙ্গির বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে চম্পার পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অপূর্ব তাহার আত্মসংযম। আজই সকালে যে এত বড় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে—তাহার কোনো দুর্ভাবনার ছায়া পর্যন্ত পড়ে নাই তাহার চোখে-মুখে। ও যেন বহু পূর্ব হইতেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

চম্পা হঠাৎ জাহাঙ্গিরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, 'বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে বৌ চুরি করতে এসেছিলেন তা। কাউকে এতটুকু জানতে দেননি!' বলিয়াই জাহাঙ্গিরের মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মা হয়তো কি ভাবছেন! কলেজে পড়ে আমরা হয়তো বেহায়া হয়ে গেছি!'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'না মা! আমাদের বাড়িতেও পর্দার অত কড়াকড়ি নেই! তোমার মুখে বোরকা দেখে একটু বরং আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম।'

চম্পা হাসিয়া বলিল, 'কি করি মা, মামার জন্য আমায় বোরকা নিতে হয়েছিল, মামা একটু গোঁড়া।'

বলিয়াই ভুণীর পানে ফিরিয়া বলিল, 'আমি কিন্তু ভাই তোমায় 'আপনি' বলতে পারব না, আর বৌদি বলে ডাক—কেমন? ভাবীটাবির চেয়ে বৌদি অনেক ভালো শোনায়।'

ভুণী এইবার হাসিয়া মুখের ঘোমটাটা বেশি করিয়া টানিয়া দিল।

এমন সময় ক্লান্ত হারুন আসিয়া বলিল, 'মা, সব জিনিসপত্র উঠে গেছে।' মাতা তাহাকে গাড়িতে উঠিতে বলিয়া চম্পাকে বলিলেন, 'এর বোধ হয় নাম শুনেছ আমিনা, এই আমাদের কবি হারুন, তহমিনার বড় ভাই। আর হারুন, ইনি আমিনা, তোমাদের প্রফেসর আজহার সাহেবের ভাগনী। আমাদের সাথে কলকাতা যাচ্ছেন। ডায়োসেশানে পড়েন।'

চম্পা আদাব করিয়া বলিল, 'আপনার যথেষ্ট নাম শুনেছি। কিছু কিছু কবিতাও পড়েছি। চমহকার লেখেন আপনি। আমার সৌভাগ্য যে, আপনার দেখা পেলুম।'

হারুন অভিভূতের মতো চম্পার পানে চাহিয়াছিল, সে যেন তাহার কল্পলোকের মানস-লক্ষ্মীকে স্বপ্নে দেখিতেছে! চম্পার এই প্রশংসায় তাহার মনে হইল, তাহার কবি-জীবন ধন্য হইয়া গেল। সে ইহার প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলিতে পারিল না, সমস্ত মুখ তার আরক্তিম হইয়া উঠিল।

ট্রেন আসিয়া পড়িল। তাহাদের সেলুনকে টানিয়া ট্রেনের পশ্চাতে জুড়িয়া দিল। জাহাঙ্গির দেখিল, জনকতক টিকটিকি তাহাদের কামরার সম্মুখ দিয়া কেবলি যাতায়াত করিতেছে।

জাহাঙ্গির কিছু বলিবার আগেই দেওয়ান সাহেবের হুঙ্কার শোনা গেল। তিনি নামিয়া তাহাদের এক তাড়া দিতেই তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

জাহাঙ্গির চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আজিকার বিপদের ছায়া তাহার মুখে ঘন বেদনার ছাপ মারিয়া দিয়াছিল। সে ভাবিতে লাগিল, যে-কোন মুহূর্তে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। বাথরুমে ঢুকিয়া সে তাহার পিস্তলটা পরীক্ষা করিয়া ভালো করিয়া তলপেটে কোঁচার নিচে সামলাইয়া রাখিল। আসিয়া চম্পাকে কি যেন ইঙ্গিত করিল, চম্পাও চক্ষু ইঙ্গিতে কি যেন বলিল। ভুণী ঘোমটার আড়াল হইতে তাহা দেখিতে পাইল। তাহার শরীর মন জ্বালা করিয়া উঠিল। ইহারা তাহা হইলে শুধু আজিকার পরিচিত নয়।

মাতা জাহাঙ্গিরের মুখ চোখ দেখিয়া বলিলেন, 'খোকা, তোর মুখ চোখ অমন কালো হয়ে গেছে কেন? কিছু খাসনি বুঝি এখনো? তুই আর হারুন কিছু খেয়ে নে ত। কি রকম মুখ চোখ বসে গেছে তোর!'

জাহাঙ্গির বলিল, 'না মা, ক্ষিদে পায়নি মোটেই, এমনি শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে।'

মা বলিলেন, 'শরীর খারাপ করছে কেন রে? যা ছেলে তুই, কারুর কথা তো শুনবিনে। অতটা রাস্তা হেঁটে এলি, কিছুতেই পাল্কিতে চড়লিনে। দেখি—বলিয়া কপালে হাত দিয়া বলিলেন, 'তোর গাও যে গরম হয়েছে খোকা! শুয়ে পড় শুয়ে পড় এইখানে।'

জাহাঙ্গির শুইয়া পড়িল। গাড়ির সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চম্পা হাসিয়া বলিল, 'ব্যস্ত হবেন না মা, নতুন দায়িত্ব ঘাড়ে নিচ্ছেন কিনা, তারই চিন্তায় ওঁর শরীর হয়তো একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

মা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'না মা, তুমি জান না, ওর শরীরের ওপর একটুও যত্ন নেই, সত্যিই ওর শরীর খারাপ করেছে।'

চম্পা বলিল, 'তা তো দেখেই বোধ হচ্ছে! ওঁর শরীরটা যেন সন্ন্যাসীর, যত রকমে পেরেছেন, ওকে নির্যাতন করেছেন। লক্ষ রাখবেন মা—সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী না হয়ে যান!'

মা হাসিয়া বলিলেন, 'এবার যার ওপর লক্ষ রাখার ভার পড়েছে—সেই দেখবেন মা। আমি তো ওকে বাগে আনতে পারিনি—দেখি অন্য কেউ পারে কিনা।'

চম্পা ভুণীর কানে কানে বলিল, 'তুমি বেশ ভালো ঘোড়সওয়ার ত বৌদি? জোর লাগাম কশে রেখো। নৈলে এ বেহেড ঘোড়া ছুটতে শুরু করলে আটকে আর রাখতে পারবে না।'

ভুণী জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, 'যদি তোমার মতো কথার চাবুক থাকত হাতে ভাই, তা হলে হয়তো পারতুম। ও ঘোড়া হয়তো একা তুমিই বাগে আনতে পারে।'

চম্পা রাম-চিমটি কাটিয়া বলিল, 'এই ননদ-নাড়া শুরু হল তাহলে।'

ভুণী উঃ করিয়া শব্দ করিয়া বলিল, 'তুমি দেখছি শূর্পণখা!'

চম্পা হাসিয়া বলিল, 'আর উনি রাবণ, তুমি বুঝি সীতা?'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'ওধারে রাম-লীলা শুরু হল, হারুনও কবিতার খাতা নিয়ে বসল, আমি ততক্ষণ কুম্ভকর্ণের ডিপুটিগিরি করি।'

বলিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িল। মাতা হাসিয়া পুত্রের ললাটে সস্নেহ কর সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

আঠারো

গাড়ি বর্ধমান আসিয়া পঁহুচিতেই কাহাদের চঞ্চল সবুট পদশব্দে জাহাঙ্গিরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাঙ্গির উঠিয়া দেখিল, সকলে ঘুমাইয়া গিয়াছে। রাত্রি কতটা হইবে, তাহা সে আন্দাজ করিতে পারিল না। কেবল হারুন একাকী জাগিয়া এক মনে বোধ হয় কবিতা লিখিতেছে। একদল সশস্ত্র গোরা ও পুলিশ তাহাদের সেলুন বারকতক প্রদক্ষিণ করিয়া সেলুনের পূর্বের গাড়িটাতে উঠিয়া বসিল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

জাহাঙ্গিরের বুঝিতে বাকি রহিল না—কোন বস্তু তাহার শির লক্ষ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সে কী করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ধাক্কা দিয়া হারুনের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া সে চুপি চুপি বলিল, 'হারুন, ভীষণ বিপদ। তোমায় একটা কাজ করতে হবে।'

হারুন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া জাহাঙ্গিরের মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সে জাহাঙ্গিরের এই অহেতুক ভীতির কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

জাহাঙ্গির বলিল, 'অনেকগুলো গোরা আর পুলিশ আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করছিল, দেখেছ?'

হারুন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'ওরা খুব সম্ভব আমাকে এ্যারেস্ট করবে। হয়তো আমাদের গাড়িও সার্চ করবে। সার্চ যদি করে—তা হলে আমরা সকলেই ভীষণ বিপদে পড়ব। তোমাকে সব কথা খুলে বলি, যাকে আমিনা বলে ভেবেছো—সে আমিনা নয়—আমাদের বিপ্লবীদলের একটি মেয়ে। ওর কাছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে। ওরা সকলেই ঘুমচ্ছে—এই অবসরে আমি আর ঐ আমিনা নেমে পড়ব স্টেশনে। তুমি আস্তে আস্তে ওর বাক্সটা নামিয়ে দেবে। কোনো ভয় করো না। মাকে ভাবতে মানা করো—আমি কালই মোটরে করে বাড়ি পৌঁছব তোমাদের সাথে সাথে।'

হারুন বোবার মতো বসিয়া রহিল। মনে হইল, তাহার বাকশক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। 'মাকে বলো—আমিনার মামা তার করায় বর্ধমান স্টেশনে তা পেয়ে আমি আমিনাকে আবার অণ্ডাল পৌঁছে দিতে যাচ্ছি—তার মায়ের ভয়ানক অসুখ বেড়েছে। অণ্ডাল থেকে তার মামা এসে নিয়ে যাবেন।'

বলিয়াই সে আস্তে ধাক্কা দিয়া চম্পাকে জাগাইল। চম্পাকে সাঙ্কেতিক ভাষাতে কি কথা বলিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার বুকের নিচে কি পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

তাহার পর বাক্স দুইটি আস্তে আস্তে দোরগোড়ায় টানিয়া দরজা খুলিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। জাহাঙ্গির আবার তাহাকে কি বলিতে সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিয়া হিন্দু-সধবার বেশে সাজিয়া বাহির হইয়া আসিল। জাহাঙ্গিরও তাড়াতাড়ি ইউরোপীয়ান বেশে সজ্জিত হইয়া লইল। ইত্যবসরে ট্রেন শক্তিগড়ে একটু দাঁড়াইয়াও ছাড়িবার উপক্রম করিতে তাহারা ধীরে ধীরে দুইজনে দুইটা বাক্স লইয়া নামিয়া পড়িল। জাহাঙ্গির চাহিয়া দেখিল, সৌভাগ্যক্রমে গোরা বা পুলিশের কেহ সেদিকে লক্ষ করিল না। তাহারা ইহাদের কলিকাতায় পাকড়াও করিবে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া হয়তো শুইয়া ছিল।

হারুন তেমনি পাথরের মতো বসিয়া রহিল। তাহার বাকশক্তি এবং নড়িবার শক্তি দু-ই যেন কে হরণ করিয়া লইয়াছে।

জাহাঙ্গির ও চম্পা বিপরীত দিককার প্লাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইতেই বর্ধমান যাইবার ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন টিকিট করিবার সময় ছিল না। চম্পাকে একখানা শূন্য ফার্স্টক্লাসে তুলিয়া দিয়া সে গার্ডকে বলিয়া আসিল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। চম্পা বলিল, 'বর্ধমানে নামা হবে না। সেখানে পুলিশে নিশ্চয়ই কড়া পাহারা দিচ্ছে।' স্থির হইল তাহারা রানিগঞ্জে নামিয়া সেখান হইতে ট্যাক্সি করিয়া কলিকাতা আসিবে। তাহা হইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

জাহাঙ্গির ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। চম্পা জাহাঙ্গিরকে বলিল, 'দাদা, তোমার মা হয়তো এতক্ষণ কি মনে করছেন!'

জাহাঙ্গির হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, মা হয়তো মনে করছেন, ছেলে এই মেয়েটাকে নিয়ে উধাও হল।'

চম্পা জাহাঙ্গিরের হাতে চিমটি কাটিয়া বলিল, 'যাও তুমি ভয়ানক দুষ্টু। আমাদের ও-কথা বলতে নেই।

জাহাঙ্গির গম্ভীর হইয়া বলিল, 'সত্যি তাই। আমাদের যে মন্ত্রে দীক্ষা, তাতে কেউ পুরুষ-নারী বলে নেই। সেখানে সকলে অগ্নি-সখা। তা নৈলে তোমার মতো রূপে-গুণে অপরূপকে কি এত কাছে পেয়ে নিজকে বিশ্বাস করতে পারতুম?'

চম্পা বলিল, 'সত্যি তোমার সে রকম দুর্বলতা আসতে পারে বলে তুমি ভয় কর?'

জাহাঙ্গির উঠিয়া বসিয়া কহিল, 'করি চম্পা। আমি আমাকে যত বেশি জানি, তুমি তা জান না।'

চম্পা ভয়ের ভান করিয়া বলিল, 'তবে তোমার সঙ্গে আসা আমার উচিত হয়নি। অথচ প্রমত-দা যাবার সময় আমায় তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে মানা করেছিলেন। তুমি নাকি নারী জাতিটাকেই ঘৃণা কর।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'কতকটা তাই। ওদের বিশ্বাস করি না—শ্রদ্ধা করি না বলেই আমার অত ভয়। যাকে শ্রদ্ধা করি না, তার অসম্মান করতে আমার বাধবে না।'

চম্পা প্রশ্ন করিল, 'এই যদি তোমার মনের ভাব তা হলে বিয়ে করতে যাচ্ছ কেন এক নারীকেই?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'বিয়ে করব কিনা জানিনে চম্পা, কিন্তু তার সর্বনাশের আর কিছু বাকি রাখিনি।'

হঠাৎ সাপ দেখিলে লোক যেমন চমকিয়া উঠে চম্পা তেমনি চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'এ তুমি কি বলছ দাদা? হয় তুমি মিথ্যা কথা বলছ—কিম্বা পাগল হয়েছ।'

জাহাঙ্গির তেমনি স্থির কণ্ঠে কহিল, 'আমি মিথ্যাও বলিনি, পাগলও হইনি চম্পা। এর পরে তোমার সাথেও হয়তো আর আমার দেখা হবে না। এই পৃথিবীর অন্তত একজন আমার বেদনার কাহিনী শুনে রাখুক—কি অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমি এসেছিলুম—কি হতে পারতুম অথচ কি হলুম।'

চম্পা কণ্ঠে বেদনা ও মিনতি ঢালিয়া দিয়া কহিল, 'দাদা তুমি একটু শুয়ে ঘুমোও দেখি। আমি জেগে থেকে রানিগঞ্জে ট্রেন এলেই উঠিয়ে দেবো। তোমার কিচ্ছু আমি জানতে চাইনে। কি হবে আমার জেনে? তোমায় দেখেছি, শ্রদ্ধা করেছি—শুধু এইটুকুই আমার যথেষ্ট।'

জাহাঙ্গির বাধা দিয়া বলিল, 'না চম্পা তোমাকে শুনতেই হবে। আমি এতদিন ভেঙে পড়িনি বা উচ্ছন্নে যাইনি প্রমত-দা ছিলেন বলে। এখন আর আমার ভয় নাই। হয় স্বর্গারোহণ করব—নয় একেবারে যে পাঁক থেকে আমি উঠেছি সেই পাঁকেই ডুবে যাব।'

চম্পা প্রতিবাদের স্বরে বলিল, 'তুমি পাঁক থেকে উঠতে পার না—যদি তা শুনেও থাক ত মিথ্যা।'

জাহাঙ্গির ম্লান হাসিয়া বলিল, 'তুমি হয়তো আমাকে পদ্মফুল মনে করছ—তা নাকি গোবরেও ফোটে চম্পা। কিন্তু আমি যে আমাকে পরীক্ষা করে দেখেছি। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে—সে পরীক্ষায় আমি আমার মূলের পাঁককে দেখতে পেয়েছি। আর সে পাঁক অন্যের গায়ে লেগেছে।'

চম্পা কি ভাবিল। তাহার পর বলিল, 'তুমি কি ভুণীর কথা বলছ? সত্যিই কি তুমি তার ক্ষতি করেছ?'

জাহাঙ্গির উত্তেজিত হইয়া বলিল, 'শুধু ক্ষতি চম্পা, যে ক্ষতির চেয়ে বড় ক্ষতি মেয়েলোকের হতে পারে না, আমি তার সেই ক্ষতি করেছি। এক মুহূর্তের দুর্বলতাকে জয় করে উঠতে পারলাম না।'

জাহাঙ্গিরের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া বলিতে লাগিল, 'তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তাকে বিয়ে করা। কিন্তু সে ত জানে না—আমি আমার পিতার কামজ সন্তান, —আমার মা ছিলেন বাইজি! একথা জানলে সে কি আর আমায় শ্রদ্ধা করতে পারবে? আমার মূলে যদি পাঁক না থাকত, তাহলে আমি অত বড় পাপ করতে পারতাম? আমার প্রতি রক্ত-কণিকায় যে ভোগী পিতা বেঁচে রয়েছে—আমি ভুললেও সে আমায় যে কেবলি নরকের দিকে টানবে চম্পা! এত ঐশ্বর্য, মা যা-ই হোন তাঁর এত স্নেহ—এই নিয়ে আর যে-কেউ হয়তো পরম সুখে দিনাতিপাত করতে পারত। আমি কিন্তু পিতা-মাতার অপরাধ সহস্র চেষ্টা করেও অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারলুম না। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলুম—ভাবলুম, আগুনে পুড়ে হয় খাঁটি হব—নয় পুড়ে ছাই হব। খাঁটি হতে পারলুম না, এখন ছাই হওয়া ছাড়া আর আমার এ জন্ম থেকে মুক্তি নেই।' জাহাঙ্গির হাঁপাইতে লাগিল।

আশ্চর্য! চম্পা ঘৃণায় সরিয়া গেল না। অধিকন্তু অধিকতর স্নেহে তাহার কপালের রুক্ষ চুলগুলো সরাইতে সরাইতে বলিল, 'লক্ষ্মীটি, চুপ করে শোও। তুমি ত রক্ত-মাংসেরই মানুষ। ভুল বড় বড় মহাপুরুষও করেন। যাঁদের জন্মে কোনো কলংক স্পর্শ করেনি, তাঁরাও ত সারা জীবন পাপে ডুবে রয়েছেন দেখছি। তোমাদের অগ্নিপন্থী দলেরই নামকরা দু-চার জনকে জানি, যারা আমার সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল। আমি ইচ্ছা করলে তাদের সর্বনাশ করতে পারতাম—করিনি, ক্ষমা করেছি। বিশেষ করে, তোমাদের অগ্নি-পন্থীদের মনে যে ভীষণ পশু রয়েছে—তারি প্রেরণায় তোমরা হত্যা করতেও ভয় পাও না। সে শুধু হত্যার জন্যই নয়—অন্য কারণেও তা জেগে উঠতে পারে। তোমাদের মনের পশুকে একেবারে মেরে ফেললে তোমাদের দেবত্ব বা মনুষ্যত্ব দিয়ে আর যাই হোক—আমাদের যে মন্ত্র, যে সাধনা তার কিছু হবে না।'

জাহাঙ্গির উঠিয়া বসিয়া চম্পার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'চম্পা, এমন কথা ত কেউ কোনো দিন বলেনি। প্রমত-দাও না।'

চম্পা বাধা দিল না তেমনি ভাবে বলিতে লাগিল, 'তবু তুমি সত্যব্রতী। তোমরা পশুকে মানুষের চামড়া পরিয়ে লুকিয়ে রাখতে জান না। অন্য যাঁদের দেখেছি, তাঁরা সমস্ত বড় কর্মী ত্যাগী বীরপুরুষ, কিন্তু এই সত্যটুকু স্বীকার তাঁরা করেননি। তাঁরা দুর্বলতাকে মহান নেপোলিয়নের লাম্পট্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন।'

জাহাঙ্গির চম্পার আজ নতুন পরিচয় পাইল। সে সহসা চম্পাকে তাহার নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'চম্পা, আমায় বাঁচাও। হয় আমায় একেবারে রসাতলে-

–যে পাঁক থেকে উঠেছি সেই পাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, নয় আমায় উর্ধ্বে নিয়ে চল হাত ধরে।'

চম্পা রহস্য-ভরা হাসি হাসিয়া বলিল, 'তোমায় বাধা দেব না। জানি আগুনের তৃষ্ণা কত প্রবল। কিন্তু কি হবে এ করে? আমার পিণ্ডকী-দা গেছে, মা গেছেন, প্রমত-দাও গেছেন। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, বজ্রপাণির দলের হয়তো একজনও আর বাইরে নেই। আমি আজ তোমার কাছে আত্মসমর্পণ না করি, কাল করতে হবে। কারণ, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার তো আর কোনো অবলম্বনই নাই। আমিও ত রক্ত-মাংসের মানুষ—আর তোমাদেরই মতো পশুত্ব দিয়ে পশুকে জয় করার সাধনা আমার। লোভ তৃষ্ণা তোমাদের কারুর চেয়ে আমার কম নেই। কিন্তু, এর যে একটামাত্র পথ খোলা ছিল—সে পথও তো তুমিই বন্ধ করেছে।... তোমার মায়ের টাকা আছে, তুমি হয়তো বেঁচে গেলেও যেতে পার—কিন্তু তাতে আমার কি? আমি কি তোমার দেবদাসী হয়ে থাকব? জাত ধর্ম আমি মানিনে, সে শিক্ষাই পাইনি জীবনে। কিন্তু আমার নারী ধর্ম তো আছে। তাকে আজ যদি বিসর্জন দিই, কাল তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—যেমন করে ভুণীকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। তোমাকে বলতে আমার লজ্জা নেই—তোমাকে দেখেই হয়তো আমার ভালো লেগেছিল। তরুণ অরুণের মতো যেদিন তুমি এসে আমাদের আঙিনায় দাঁড়িয়েছিলে তোমার প্রখর দীপ্তি নিয়ে—সেই দিন থেকে তোমায় সকল প্রাণ মন দিয়ে শ্রদ্ধা করে আসছি। মরণোন্মুখ তৃষ্ণাতুর তুমি এসে দাঁড়িয়েছ—তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই—তবু ঐটুকুর বিনিময়ে আমার এমন অমূল্য শ্রদ্ধাটুকু কেড়ে নিও না। তুমি ভুণীকে বিয়ে করে সুখী হও, আমি তোমাদের ভগিনীর স্নেহে সেবা করব,—যত্ন করব, তারপর মা যদি ফেরেন,...মার কোলে ফিরে যাব।...' চম্পা সহসা কাঁদিয়া ফেলিল।

জাহাঙ্গির চম্পাকে বলিল, 'তুমি ঠিকই বলেছ চম্পা। আগুনের আকুল তিয়াসা ত মিটবার নয়। তৃষ্ণা কেবল বেড়েই চলবে? পশুর পশু-জন্ম সার্থক হয় দেবীর বেদিতলে তার বলিদান হয়ে গেলে।... জীবনে কাউকে ভালোবাসিনি, কারুর ভালোবাসা পাইনি, আজ তাও যখন পেয়ে গেলুম দৈববলে—তখন ত আমি বেঁচে গেলুম।... আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছি চম্পা, তোমাকে মার হাতে সঁপে দিয়ে—যে তুফান উঠেছে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব—প্রমত-দার মতো। আমার যে ঐশ্বর্য রইল—তাতে তোমাদের এ জীবনে শান্তি ছাড়া আর কোনো কিছুর অভাব হবে না। আমি আমার সকল ঐশ্বর্য তোমায় দিয়ে যাব। তুমি শুধু আমারই হবে, ঐশ্বর্য দেশ-জননীর দুঃখী সন্তান আর ভাই-বোনদের বিলিয়ে দিও।'

চম্পা দুই হাতে জাহাঙ্গিরকে জড়াইয়া বালিকার মতো কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ যেন পাহাড় ফাটিয়া ঝর্ণা ধারার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছে।

জাহাঙ্গির ধীর শান্তস্বরে বলিতে লাগিল, 'আমি জীবনে ভাবিনি—নারীজাতিকে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারব—তাদের ভালোবাসতে পারব—তাদের প্রেমে বিশ্বাস করব।... আজ আমার কাছে এই পাপের পৃথিবীও সুন্দর হয়ে উঠেছে। আমার মরুভূমির উর্ধ্বে

মেঘের স্বপন ভেসে উঠেছে! ফুল ফুটল না সে মরুভূমিতে—দুঃখ করিনে তার জন্য। আমার চিরদগ্ধ বুক তো শীতল হল। সূর্যমুখী যেমন করিয়া অষ্ট-সূর্যের পানে চায়, তেমনি করিয়া মুখ তুলিয়া চম্পা বলিল, 'তোমার ঐশ্বর্যের অভিশাপ আমায় দিয়ে যেও না, ও আমি সহ্য করতে পারব না। সবাই তো আমায় ছেড়ে গেল, তুমি যেও না।'

জাহাঙ্গির চম্পার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'তোমাকে তো দিয়ে যাব না ওসব চম্পা। আমার মতো যেসব যুবক দেশ-জননীর পায়ে আত্মবলি দিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে গেল, তাদের নিরন্ন মুখে দু মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত হবে তোমার। তুমি হবে তাদের দেবী অন্নপূর্ণা।'

ট্রেন এক স্টেশনে থামিতেই চম্পা বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, 'ওঠ ওঠ, রানিগঞ্জে এসে পৌঁছেছি। মাত্র দু মিনিট স্টপেজ।'

নামিয়া ট্যাক্সি ঠিক করিতে আরও আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। যখন তাহারা যাত্রা করিল, তখন রাত্রি দুইটা।

মোটর চলিতে আরম্ভ করিলে জাহাঙ্গির এলাইয়া পড়িয়া বলিল, 'আমার কি মনে হচ্ছে চম্পা, জান? যেন এ পথের আর শেষ না হয়। যুগ-যুগান্তর ধরে শুধু তোমায় পাশে নিয়ে এমনি করে ছুটে চলি।'

চম্পা কথা কহিল না। চক্ষু বুজিয়া কি যে ভাবিতেছিল। কেহ আর কোনো কথা কহিল না। গাড়ি উল্কাবেগে ছুটিতে লাগিল। মোটর হাওড়া ব্রিজের মোড়ে আসিতেই হঠাৎ চার-পাঁচজন সার্জেন্ট গাড়ি ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া মোটর থামাইবার আদেশ করিল।

জাহাঙ্গির জ্যা-ছিন্ন ধনুকের মতো সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সশস্ত্র সার্জেন্ট-দল রিভলবার হাতে লইয়া গাড়িতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। জাহাঙ্গির পিস্তল ছুড়িতে একজন সার্জেন্ট মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। অবশেষে অন্য সার্জেন্টগণ জাহাঙ্গিরকে ধরিয়া ফেলিল।

এই ধস্তাধস্তির ফলে চম্পা কখন সরিয়া পড়িয়াছিল, কেহ টের পাইল না।

দুই-তিনজন সার্জেন্ট ঐ ট্যাক্সি লইয়া দুই-তিন দিকে তাহার খোঁজে ধাওয়া করিল।

উনিশ

এদিকে জাহাঙ্গিরের মাতা হাওড়া স্টেশনে পঁহুছিয়া জাহাঙ্গির ও চম্পাকে দেখিতে না পাইয়া এবং হারুনের কাছে সমস্ত শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভুণীর মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল।

হারুন কিন্তু যে ভয় করিতেছিল, তাহার কিছুই হইল না। কেহ তাহাদের গাড়ি সার্চ করিল না। হারুন দেখিল, প্লাটফর্ম মিলিটারি পুলিশে ও গোরায় ছাইয়া ফেলিয়াছে। কয়েকজন যুবককে ধরিয়া তাহারা প্রিজনার-ভ্যানে পুরিল, তাহাও সে দেখিল।

সে দেখিল ধৃত বন্দিদের মধ্যে জাহাঙ্গির নাই। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

হারুন জাহাঙ্গিরের মাতাকে উপদেশ মতোই সব কথা বলিয়াছিল। সে যে বিপ্লবীদলের, সে কথা সে গোপন করিয়া গেল।

দেওয়ান সাহেব ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জিনিসপত্র গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া দেওয়ান সাহেব বলিলেন, 'আমি ছেলের খোঁজে যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে পুলিশের কাছেও যেতে হবে। যেমন করে হোক ওর কিনারা করে তবে জলগ্রহণ করব।'

জাহাঙ্গিরের মাতা সাশ্রুনেত্রে দেওয়ান সাহেবের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। কিছু বলিতে পারিলেন না।

মাঝে মাঝে কেবল হারুনের উন্মাদিনী মাতা কাঁদিয়া উঠিতে লাগিলেন, 'মীনা! মীনা কোথায় গেল আমার? সে আর ফিরবে না। আবার পালিয়ে গেল!'

এত আনন্দের মাঝে সহসা যেন ঝড় উঠিয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

জাহাঙ্গিরের মাতা কাঁদিলেন না। ঝড় উঠিবার পূর্বে প্রকৃতি যেমন শান্ত গম্ভীর মূর্তি ধারণ করে—তেমনি বিষাদ-ঘন মূর্তি লইয়া বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন।

কাহারও মুখে কথাটি নাই। জাহাঙ্গিরের মাতা আদর করিয়া হারুনদের সকলকে বাড়িতে উঠাইয়া সকলের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মুখরা মোমি এবং মোবারক পর্যন্ত কথাটি কহিতে সাহস পাইল না।

দ্বিপ্রহরে দেওয়ান সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ চোখ দেখিয়া জাহাঙ্গিরের মাতা ভয় খাইয়া গেলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কোনো রকমে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'দেওয়ান সাহেব! আমার খোকা?'

দেওয়ান শান্তগম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'বিপ্লবীদের সাথে ধরা পড়েছে! হতভাগ্য!...' তিনি আর বলিতে পারিলেন না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল!

জাহাঙ্গিরের মাতা সকালে উঠিয়াই সমস্ত সংবাদপত্র আনাইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুই দিনের মধ্যে বাংলাদেশে যে ভীষণ ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে—তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছেন সংবাদপত্র পড়িয়াই।

শত শত যুবক কারারুদ্ধ হইয়াছে। বিপ্লবীদের সেই ভীষণ জার্মান ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সারা দেশ ব্যাপিয়া পুলিশ জাল ফেলিয়াছে!—

কাজেই দেওয়ান সাহেবের এই সংবাদে তিনি বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। দাসী-বাঁদিরা যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল।...

কুড়ি

বজ্রপাণি, প্রমত্ত প্রভৃতির সাথে জাহাঙ্গিরেরও দ্বীপান্তর হইল। তাহার সত্যকার নাম প্রকাশ পাইল না। জাহাঙ্গির তাহার নাম বলিয়াছিল স্বদেশকুমার। সেই নামেই তাহার শাস্তি হইয়া গেল।

ফিরদৌস বেগম ও দেওয়ান সাহেব লক্ষাধিক টাকা খরচ করিয়াও কোন কিনারা করিতে পারিলেন না।

যেদিন জাহাঙ্গিরের বিচার হইয়া গেল সেইদিন সন্ধ্যায় মাতা তাহার সহিত আলিপুর জেলে গিয়া দেখা করিলেন। মাতা আর সেখানে কাঁদিলেন না। শুধু বলিলেন, 'খোকা, তুই তো চললি, তোর এই ঐশ্বর্য কাকে দিয়ে যাব?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'তুমিও কি চলে যাবে মা?'

মাতা শান্তস্বরে বলিলেন, 'তুই তো আমায় থাকতে দিলিনে। আমি আমার ঐ তীর্থে গিয়ে একবার কাবা ঘরের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করব খোদাকে—কেন তিনি আমায় এত বড় শাস্তি দিলেন?'

জাহাঙ্গির বলিল, 'আর তো তোমাকে নিষেধ করবার অধিকার আমার নেই মা! তুমি যেখানে গিয়ে শান্তি পাও, যাও। যদি ফিরে আসি, আর তুমি বেঁচে থাক, দেখা হবে!' বলিয়াই একটু ভাবিয়া বলিল, 'চম্পা এসেছিল তোমার কাছে?'

মাতা বলিলেন, 'এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

জাহাঙ্গির বলিল, 'ভুল করেছ মা; ও ঐশ্বর্যের মালিক যদি আমিই হই, তাহলে ঐ ঐশ্বর্যের ভার তারই হাতে ছেড়ে দিও! আমার মার মতো শত শত মা আজ নিরন্ন, তাদের মুখে তাদের সন্তানের মুখে সে অন্ন দেবে। ও ঐশ্বর্য এখন আমার দেশের নির্যাতিত ভাই-বোনদের। এবার সে এলে তাকে ফিরিও না। হাঁ, ভুণীকে আমার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দিও। ও অনেক দুঃখ পেয়েছে।'

মা কিছুক্ষণ ভাবিয়া শান্তস্বরে বলিলেন, 'আচ্ছা তাই হবে।' তিনি অধর দংশন করিয়া কান্নার বেগ সামলাইতে লাগিলেন।

মাতার সহিত সকলেই আসিয়াছিল। জাহাঙ্গির হাসিয়া হারুনের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তোমার কথাই সত্য হল কবি, নারী 'কুহেলিকা'।' হারুন কাঁদিয়া ফেলিল।

ভুণী অস্ফুটস্বরে খালি বলিয়া উঠিল, 'সত্যি তুমি নিষ্ঠুর।'

জেলের ভিতর পাগলা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। জেল ভাঙিয়া কয়েকজন রাজবন্দী পলাইয়াছে।

স-ওয়ার্ডার জেলার আসিয়া জাহাঙ্গিরকে লইয়া চলিয়া গেল।

মাতা সেখানে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'খোকা! আমার খোকা!'

॥ সমাপ্ত ॥